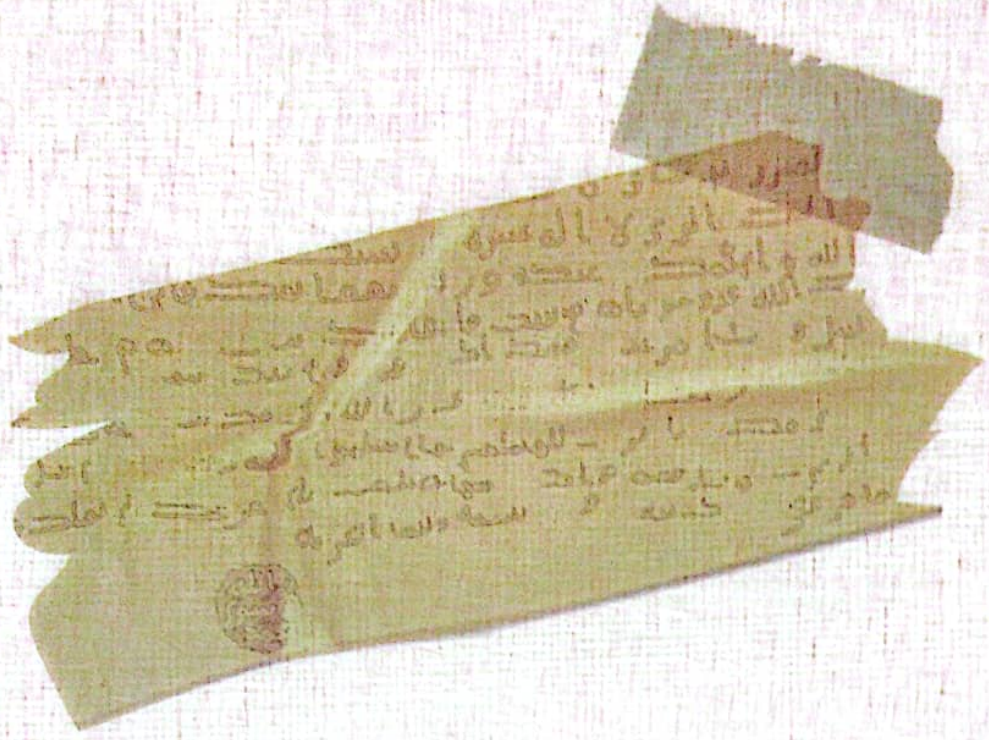

হুদাইবিয়ার সন্ধি

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

CamScanner

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, অতীতের সাথে বর্তমানের ও জীবনের সাথে মৃত্যুর সংযোগ গড়ে তোলা বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়ের দাবি। এ দাবি পূরণের শতেক পথের একটি হলো বই। সেই প্যাপিরাসের যুগ থেকে আজ ইবুকের যুগ পর্যন্ত, হাজার বছরের পরিক্রমায়—আল্লাহর কালাম, রাসুলের বাণী, শরীয়াতের বিধান, মানুষের চিন্তা, ইতিহাসের দলিল ইত্যাদির লিখিত রূপ আমাদের জীবনের প্রয়োজন। মননশীল মনের খোরাক।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময়ের নিরন্তর পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও সমাজের যোগসূত্র গেঁথে দিতে, দ্বীন-ধর্মের জ্ঞান, সমাজ-সংসারের গল্প, নির্জলা ইতিহাস কিংবা উপাখ্যান-উপন্যাস, তাসাউফ তত্ত্ব থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, হার্দিক শিল্পের কথকতা, লাইফস্টাইল অথবা মোটিভেশন—হাজারো বিষয় নিয়ে সংবেদনশীল পাঠকের সাথে অক্ষর-শব্দ- বাক্যের বাঁধনে জড়িয়ে, বই নামের এক অলৌকিক জগতে ডুব দিয়ে আলোকিত হতে, বিশ্বাস ও শুদ্ধতার আয়নায় দাঁড়িয়ে—পরিশীলিত ও শিল্পিত রূপে পাণ্ডুলিপির রূপায়ণ কল্পেই 'পেনফিল্ড পাবলিকেশন'-এর পথচলা। এ পথের সহযাত্রী হিসেবে আপনাকে স্বাগত, প্রিয় পাঠক!

পেনফিল্ড পাবলিকেশন
বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র

CamScanner

হুদাইবিয়ার সন্ধি

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

পেনফ্রিল্ড
পাবলিকেশন

CamScanner

বই	হুদাইবিয়ার সন্ধি
মূল	শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল
অনুবাদ	তাইব হোসেন
শারয়ী নিরীক্ষণ	উস্তায সালমান মাসরুর
সম্পাদনা	শাকির মাহমুদ সাফাত
বানান নিরীক্ষণ	মারজান মুহাম্মাদ আলিফ
প্রচ্ছদ	ইলিয়াস বিন মাজহার
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুহারেব মুহাম্মাদ

CamScanner

হুদাইবিয়ার সন্ধি

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব

মূল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদ

তাইব হোসেন

পাবলিকেশন

হুদাইবিয়ার সন্ধি

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com, www.wafilife.com

www.jajeera.com, www.boiferry.com

Hudaibiyar Sondhi

Sheikh Ahmad Musa Jibril

ISBN : 978-984-97180-4-8

Published By Penfield Publication, Dhaka, Bangladesh

Price: Tk. 180.00, Us $: 8.00. Only

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ও একমাত্র পরিবেশক

জাজিরা.কম

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা, দোকান নং- ০৬) বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল : +৮৮ ০১৪০৭ ০৫৬ ৯৬১

CamScanner

অর্পণ

একজন আলিম, শাইখ ও দায়ি। মৃত-সাগরের ওপারে থেকেও যিনি তাওহিদের আলো জ্বালিয়েছেন পুরো বিশ্বজুড়ে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিস্মৃতপ্রায় সেই মহান আলিমের তাওহিদি গাইরত এখনো বিস্মিত করার মতো। তাঁর একটি কথা জীবনের উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার—শুরুতে তাওহিদ, সবসময় তাওহিদ।

CamScanner

সূত্রপাত

এ দ্বীন তাওহিদের দ্বীন। তাওহিদ যার বিশুদ্ধ, তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে অনুযায়ীই গৃহীত হয়। মূলত পুরো মানবজীবনের কাঠামো নির্ভর করে, চিন্তার পরিশুদ্ধির ওপর। দ্বীনের প্রতিটি বিধান বা মাসআলা পুঙ্খানুপুঙ্খ না জানা থাকলেও এ দ্বীনের মেজাজ বা প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা রাখা অবশ্যকর্তব্য। যে এই তাওহিদি দ্বীনের মানহাজ ও রূপ আত্মস্থ করেনি, তার জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করা কখনোই সম্ভব নয়। দেখা যাবে, সে কোনো এক পরিস্থিতিতে দ্বীনের খণ্ডিত বয়ান নিয়ে হাজির হচ্ছে। দ্বীনকে কাটছাঁট করছে নিজের অজান্তেই। আজকাল এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। পরাজিত মানসিকতা ও আপসকামিতার মানহাজকে বৈধপ্রমাণে করা হচ্ছে বিভিন্ন কসরত। নববীযুগ থেকে আমরা যত দূরে যাচ্ছি, ক্রমশ দ্বীনের সেই হাকিকতও অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' যুগ যুগ ধরে আপসকামীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ হিসেবে এর ওপর স্বতন্ত্র রচনার যেন একান্তই প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন পূরণেরই একটি ছোট্ট প্রয়াস এই বই। বইটি মূলত শাইখ

আহমাদ মূসা জিবরীলের লেকচার সিরিজ '*The Treaty of Hudaybiyyah : Falsehood vs Facts*'-এর গ্রন্থিত রূপ। সেই সাথে আমি নতুন করে শাইখের জীবনী হালনাগাদ করেছি। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন বইটিকে কবুল করে নেন। এর সাথে জড়িত সবাইকে যেন আবৃত করে নেন ইখলাসের চাদরে।

তাইব হোসেন

২৬ রমাদান, ১৪৪৪ হিজরি
১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ঈসায়ী

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিচিতি

ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভুত শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি খুব ছোট, তাঁর বাবা শাইখ মূসা আবদুল্লাহ জিবরীল তখন মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিবারসহ সৌদি আরবে পাড়ি জমান। পড়াশোনা শেষে পুনরায় তিনি সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের বয়স ছিল তখন মাত্র বারো।

পড়াশোনা ও ইলম-অর্জন

সৌদি আরবে বসবাসকালে এগারো বছর বয়সেই তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর কৈশোর থেকেই শাইখ তাঁর নিজ পিতার কাছেই ইসলামী জ্ঞান অর্জন শুরু করেন। হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তিনি পুরো *'সহিহ বুখারী'* ও *'সহিহ মুসলিম'* হিফয (মুখস্থ) করেন। তিনি তাঁর বাবার কাছে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ'র পুরো *'মাজমুউল ফাতাওয়া'* (৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত), ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ'র কিতাব ও ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ'র

'আল-মুহাল্লা' (১১ খণ্ডে সমাপ্ত) পড়া সম্পন্ন করেন আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগেই। ১৯৮৯ সালে তিনি হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *সহিহ বুখারী* ও *সহিহ মুসলিমের* সনদও মুখস্থ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাদিসের মোট নয়টি গ্রন্থ মুখস্থ করেন :

১. সহিহ বুখারী

২. সহিহ মুসলিম

৩. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

৪. মুসনাদু আহমাদ

৫. সুনানুদ দারিমী

৬. সুনানুন নাসায়ী

৭. সুনানু আবি দাউদ

৮. সুনানুত তিরমিযী

৯. সুনানু ইবনি মাজাহ

হাইস্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ অনুষদে পড়ার জন্য দ্বিতীয় বারের মতো তিনি সৌদি আরবে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৌদি আরবের বহু বিশ্বনন্দিত উলামায়ে কেরামের অধীনে অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁদের ব্যক্তিগত দারসে বসারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বহু আলিমের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন।

শাইখের উস্তাযবৃন্দ :

১. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন। আহমাদ মূসা

জিবরীল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাব আগাগোড়া অধ্যয়ন করেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াও লাভ করেন।

২. শাইখ আবদুল আযীয ইবনু বায। শাইখ ইবনু বাযের মৃত্যুর তিন মাস আগে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল ও তাঁর বাবা শাইখ মূসা আবদুল্লাহ জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ আমেরিকায় থাকা সৌদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের ইলম ও দাওয়াহ-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ ইবনু বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করে বলেছেন, তিনি তাঁর সুপরিচিত এবং উত্তম আকিদা পোষণকারী।

৩. শাইখ বাকর আবু যায়িদ। শাইখ বাকর আবু যায়িদের একান্ত দারসে তিনি মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন।

৪. শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানকিতী। শাইখ আহমাদ তাঁর অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেছেন।

৫. আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবী। তাঁর অধীনেও অধ্যয়ন করেছেন তিনি। শাইখ হামুদ বিন উকলার অন্যতম কাছের ছাত্র ছিলেন তিনি। শাইখ আহমাদ তাঁর কাছ থেকে তাযকিয়াও লাভ করেন। তিনি শাইখ হামুদের মৃত্যুর আগপর্যন্ত তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

৬. শাইখ ইহসান ইলাহি জহির। শাইখ ইহসান ছিলেন শাইখ আহমাদের বাবার বন্ধু। শাইখ ইহসানের অনেকগুলো বই শাইখ আহমাদ কৈশোরেই মুখস্থ করে ফেলেন। শাইখ ইহসান কিশোর শাইখ

CamScanner

আহমাদ মূসা জিবরীলের হিফয-প্রতিভা এবং তাঁর বইগুলোর ওপর শাইখ আহমাদের বুঝ দেখে বলেন, 'এই ছেলে তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে!' তিনি তাঁর বাবাকে বলেন, 'আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন, ইন-শা-আল্লাহ।'

৭. শাইখ সফিউর রহমান আল-মুবারাকপুরী। বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ *'আর-রাহিকুল মাখতুম'*-এর লেখক শাইখ সফিউর রহমান আল-মুবারাকপুরীর অধীনেও শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন।

৮. শাইখ মুকবিল ইবনু হাদি আল-ওয়াদিয়ী।

৯. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-গুনাঈমান।

১০. শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব।

১১. শাইখ আতিয়াহ আস-সালিম। শাইখ আতিয়াহ আস-সালিম ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতীর প্রধান ছাত্র। শাইখ আশ-শানকিতীর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *'আদওয়ায়ুল বায়ান'*-এর কাজ তিনিই সমাপ্ত করেন।

১২. শাইখ ইবরাহীম আল-হুসাইন। তিনি ছিলেন শাইখ ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ'র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর।

১৩. শাইখ আবদুল্লাহ আল-কাওদ। 'আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা'—Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas—এর প্রথম দিকের সদস্য।

১৪. শাইখ সালিহ আল-হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান। তিনি ছিলেন দুই পবিত্র মাসজিদের রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান।

CamScanner

১৫. শাইখ হামাদ আল-আনসারী। আহমাদ মূসা জিবরীল মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল-আনসারীর অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন।

১৬. শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহ। তাঁর অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল-আলবানী ওয়াসিয়াতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন।

১৭. শাইখ মূসা আল-কারনী। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ রবি আল-মাদখালীর জামাতা শাইখ মূসা আল-কারনীরও ছাত্র। শাইখ মূসা আল-কারনী ছিলেন তাঁর উসুল-শিক্ষক।

১৮. শাইখ আবদুল কাদির শাইবাত। শাইখ আবদুল কাদির শাইবাত তাঁর বাবারও উস্তায ছিলেন।

১৯. শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ। কুরআনের ব্যাপারে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ থেকে ইজাযাহপ্রাপ্ত হন।

ইলম অর্জনের জন্য শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল মিশর, জর্দানসহ বহু দেশে সফর করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ও আইনের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

দাওয়াত ও কর্ম

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পরও তিনি তাঁর উস্তাযদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেন। তাদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করতেন। দাওয়াহর ময়দানে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মমুখর। বহু বছর ধরে তিনি অনলাইনে সর্বোচ্চ ভিজিট হওয়া ইসলামী সাইট পরিচালনা করে আসছিলেন। সেখানে বিশ্বের বিখ্যাত হকপন্থি উলামায়ে

CamScanner

কেরামের বইগুলো থাকত। এই সাইটের মাধ্যমে ইলম অর্জন আরও সহজ হয়। বহুদিন যাবৎ পশ্চিমে তাওহিদের ইলম ছিল অপ্রতুল। এরপর ২০০২ সালে এই সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তাওহিদ, আকিদা, আত্মশুদ্ধি, ফিকহ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে শাইখের বহু লেকচার, লেকচার-সিরিজ ও আর্টিকেল অনলাইনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর কিছু জনপ্রিয় লেকচার-সিরিজ হলো :

- *Legends of Islam Series*
- *The Passion Of The Christ Series*
- *Gems of Ramadan Series*
- *The Comprehensive Fiqh of Fasting Series - Sharh Zaad al-Mustaqni'*
- *Tawheed Series - Sharh Usool ath-Thalatha*
- *Islamic Manners Series*
- *Women With Legacies Series*
- *Sharh Bulugh al-Maram Series*
- *Sharh al-Aqeedah at-Tahawiyyah Series*
- *The Causes of Istighfar Series*
- *The Treaty of Hudaybiyyah - Falsehood vs Facts Series*
- *Explanation of Furu' Al-Fiqh Series (ongoing)*
- *Tafsir al-Qur'an al-'Adham Series (ongoing)*

CamScanner

- *The Conqueror of the World*
- *The Battle Of Ahzab*
- *The Punishment of Bani Kuraidhah*
- *The Plot of The Hypocrites*

ইংরেজি-ভাষী মুসলিমদের জন্য শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহস্বরূপ। সুদূর আমেরিকার গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশে শাইখের বহু লেকচার অনূদিত হয়েছে। এ দেশেও শাইখ অনেক জনপ্রিয়। তাঁর বইও এর ব্যক্তিক্রম নয়। আমরা দুআ করি আল্লাহ শাইখকে নেক হায়াত দান করুন এবং তিনি যেন ইসলামী শরিয়াহর বিভিন্ন ইলমি শাখায় আরও অবদান রাখতে পারেন। আল্লাহ তাঁকে সত্যের পথে অটল ও অবিচল রাখুন।

সম্পাদকের কথা

ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله

واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো, আল্লাহর কিতাব। আর এ কিতাবের আলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হলেন, সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর আনীত দ্বীনই আমাদের দ্বীন। তাঁর বাতলে দেওয়া জীবনব্যবস্থাই আমাদের জীবনব্যবস্থা।

এ দ্বীন শাশ্বত ও চির সমুন্নত। এ দ্বীন সুস্পষ্ট ও সরল। এখানে কোনো বক্রতা নেই। নেই কোনো অস্পষ্টতা। এর মূলনীতি ও মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নেই কোনো ভিন্ন মত বা পথে যাওয়ার সুযোগ। তবে শাখাগত বিষয়গুলোতে যেখানে ইজতিহাদ-গবেষণার সুযোগ রয়েছে—সেখানে কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ভিন্নমতেরও সুযোগ রয়েছে। তবে সেটা দ্বীনের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস বা মূলনীতির ক্ষেত্রে নয়, বরং ফিকহ-শাস্ত্রের শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে।

CamScanner

কিন্তু এই সুযোগের অপব্যবহার করে কিছু পরাজিত মানসিকতার অর্বাচীন, আল্লাহর কিতাব মহিমান্বিত কুরআন ও এর ব্যবহারিক উদাহরণ নবীজির ﷺ জীবনাদর্শের কোনো একটি অংশকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এমন কিছু মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যা ফিকহ-শাস্ত্রের শাখাগত কোনো বিষয় নয়। বরং, তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বীনের মূলনীতিতে আপসের প্রশ্ন চলে আসে। প্রশ্নবিদ্ধ হয় কুরআনের শতসহস্র আয়াত। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বড়ো একটি অংশ। ভুল প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কেরামসহ উম্মাহর দেড় হাজার বছরের আলিমদের ইজমা।

অথচ, সে বিষয়গুলো মোটেই বিতর্কিত কোনো বিষয় নয়। বরং, কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা—তথা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জীবনাদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, সম্মতি ও শ্রেষ্ঠ যুগের ইজমায়ে উম্মাহর আলোকে প্রতিষ্ঠিত সত্য ও সুস্পষ্ট বিষয়। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক এমন সুস্পষ্ট কিছু বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে সেগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে, যার মাধ্যেম তারা নিজেদের আপসকামী ও পরজিত মানসিকতাকে ঢেকে রাখতে পারবে ভেবে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়।

এমনই একটি বিষয় হলো, ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। কুরআনুল কারিমে যাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সুস্পষ্ট বিজয়' নামে। যার প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে সাইয়িদুনা ওয়া হাবিবুনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ, শৌর্য, বাহাদুরি, আত্মমর্যাদাবোধ ও আপসহীন মানসিকতার নজির। একটি প্রতিষ্ঠিত জোট, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থার মোকাবিলায় সত্যের ঝান্ডা নিয়ে মদিনায় জন্ম নেওয়া ছোট্ট ও নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক দলিল। এটা ছিল সত্যই সুস্পষ্ট বিজয়। মিথ্যার সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব। মিথ্যার সামনে সত্যানুসারীদের সিনা টান করে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা।

CamScanner

তবে এর সাময়িক শান্তিচুক্তির ধারাগুলোকেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে যুগ যুগ ধরে নিজেদের পরাজিত ও আপসকামী মানসিকতার দলিল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে বাতিলের সাথে আপসকামীরা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্বীনের খণ্ডিত বয়ান নিয়ে হাজির হওয়া, দ্বীনকে কাটছাঁট করে উপস্থাপন, বাতিলের পছন্দসই পন্থায় ইসলামকে চিত্রায়ণ—আজকাল এমন নানা উপায়ে পরাজিত মানসিকতা ও আপসকামিতার মানহাজকে বৈধপ্রমাণে করা হচ্ছে বিভিন্ন কসরত।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করা যে চুক্তি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত সুস্পষ্ট বিজয় এবং একের পর এক বিজয়গাথার সূচনা—অথচ, এর হাকিকতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তারা দাবি করে ও প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে, এ চুক্তির মাধ্যমে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছিলেন!

তাই এ ঐতিহাসিক সন্ধির হাকিকত নিয়ে ব্যাখ্যামূলক স্বতন্ত্র রচনার যেন একান্তই প্রয়োজন ছিল। আর এ বইটি সেই প্রয়োজন পূরণেরই একটি ছোট্ট প্রয়াস। বইটি মূলত শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের লেকচার সিরিজ 'The Treaty of Hudaybiyyah : Falsehood vs Facts'-এর গ্রন্থিত রূপ।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য ইংরেজি থেকে এর অনুবাদ করেছেন মুহতারাম তাইব হোসেন হাফিজাহুল্লাহ। তিনি যথেষ্ট প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সেই সাথে বেশ কিছু পরিভাষা ও প্রসঙ্গ পাঠকদের নিকট পরিষ্কার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় টীকাও যুক্ত করেছেন। এরপরও বইটি সম্পাদনা করার সময় আমরা শাইখের মূল লেকচার পাশে রেখেছিলাম—কারণ শাইখের লেকচারের উদ্দিষ্ট শ্রোতা ও আমাদের বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠক যেহেতু ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সমাজের—তাই সম্পাদনার ক্ষেত্রে সঠিক শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে শাইখের ব্যবহৃত শব্দ ও বাচনভঙ্গি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে অনেকটাই সহায়ক। সেই

CamScanner

সাথে পাঠকদের জানার সুবিধার্থে ও দ্ব্যর্থতা নিরসনে আমাদের পক্ষ থেকেও কয়েকটি টীকা সংযোজন করা হয়েছে। বইটির শারয়ী নিরীক্ষণ করেছেন, উস্তাযে মুহতারাম মুফতি সালমান মাসরুর হাফিজাহুল্লাহ। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি বইটি যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্তভাবে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। এরপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে রয়ে যাওয়া কোনো ত্রুটি, বোদ্ধা পাঠকবৃন্দের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল।

বইটি পড়তে গিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বারবার অভিভূত হয়েছি, আপসকামী ও পরাজিত মানসিকতার লোকদের বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডনে কুরআন-সুন্নাহ ও সীরাত থেকে দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাফিজাহুল্লাহর আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে। আমাদের মনে হয়েছে এই মর্ডানিজমের বৈশ্বিক ফিতনার যুগে এ বইয়ে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই জরুরি। এমন জরুরি বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মলাটবদ্ধ হয়েছে শাইখের মাত্র দুই ঘণ্টার একটি লেকচার থেকে—আল্লাহু আকবার—শাইখের ইলমি যোগ্যতার এ মাকামের কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়। যেকোনো বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর এমন ইলমি আলোচনার যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা করলে নিম্নোক্ত হাদিসের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—যেখানে মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ،

> ‘আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।’[সহিহ বুখারী : ৩১১৬]

আল্লাহ তাআলা উম্মাহর কল্যাণের জন্যই শাইখের মাঝে দ্বীনি ইলমের এই কল্যাণ দান করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন শাইখকে বাতিলের রোষানল থেকে হিফাজত করেন এবং আমাদেরকে যেন তাঁর ইলম থেকে কল্যাণ হাসিল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

আহকারুল ইবাদ
শাকির মাহমুদ সাফাত
১৩ জুন ২০২৩ ঈসায়ী

সূচিপত্র

অধ্যায় এক : কাপুরুষ প্রজন্ম / ২৫

অধ্যায় দুই : আপসকামিতা / ৩২

অধ্যায় তিন : মর্যাদাপূর্ণ বাইয়াত / ৩৮

অধ্যায় চার : ইয়াহুদিজাত বৈশিষ্ট্য / ৪৪

অধ্যায় পাঁচ : আসমানি সিদ্ধান্ত / ৫০

অধ্যায় ছয় : অজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি / ৫৮

অধ্যায় সাত : যে পাঠ উপেক্ষিত / ৭৬

CamScanner

অধ্যায় এক

কাপুরুষ প্রজন্ম

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপস করা কিছু লোক সবসময় নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া নীতির সমর্থনে হুদাইবিয়ার সন্ধির অপব্যাখ্যা করে থাকে। লঙ্ঘন করে আল্লাহর দ্বীনের মূলনীতি আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা।[১] কিংবা হালকা করে উপস্থাপন করে এ গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টিকে। এরা আল্লাহর শত্রুদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত ভৃত্য। তাদের পছন্দ তুলে ধরে, নিজেদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে যুক্তি বা অজুহাত দাঁড় করাতে এরা সিদ্ধহস্ত। আর এ সবকিছুর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে এরা উপস্থাপন করে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে।

হিজরতের ছয় বছর পর মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে হুদাইবিয়ায় এ চুক্তি সম্পন্ন হয়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদিনায় থাকতেন।

---

১. 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'— আকিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার অর্থ আল্লাহর জন্য মিত্রতা, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কহীনতা, শত্রুতা ও ঘৃণা করা। এটি ইসলামের একত্ববাদের সারনির্যাস। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তেই ঘৃণাপোষণ করা।' (তাবারানী : ১১৩৭২, সিলসিলাহ সহিহাহ : ৯৯৮, ১৭২৮) –অনুবাদক

হুদাইবিয়ার এ ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যিলকদ মাসে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারেরও বেশি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় উমরাহ করতে যান। তখন মক্কা ছিল কুরাইশ-কাফিরদের শাসিত অঞ্চল। সাথে করে তাঁরা কোনো ভারী অস্ত্র না নিয়ে কেবল তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের সাধারণ তরবারি নিয়ে যান, যেন সহজেই উমরাহ করে ফিরে আসতে পারেন। তারা মূলত উমরাহ করার নিয়াতেই গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কুরাইশরা এই সফরকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। তারা শপথ করল, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দেবে না।

এ ঘটনার মাত্র তেরো মাস আগেই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরাইশ ও তাদের মিত্রবাহিনীর সাথে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, পরিবেশটা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল! কুরাইশদের নীতি ও রীতি এমন ছিল যে—তাদের শত্রুপক্ষ যদি শান্তিপূর্ণভাবে হজের জন্য আসত, তবে তাদেরকে হারামে প্রবেশ করতে দিত। কিন্তু সকল যুগের তাওহিদবাদীদের মতো রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিরাও কাফিরদের থেকে সবসময় বিশেষ শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত রীতি ভুলে কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁরা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসজিদুল হারামে ঢুকতেই দেবে না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধা দেওয়ার জন্য জোর খাটাতে তারা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে পাঠায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তখনো কাফির ছিলেন। তারা মক্কার আশপাশের কিছু গোত্রও জড়ো করে।

---

২. খন্দক অর্থ পরিখা। এ যুদ্ধে মদিনার প্রবেশপথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে তা খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অপরদিকে কুরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তি মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য একত্র হয় বলে একে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধের সঠিক তারিখ নির্ধারণে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে এ যুদ্ধ পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (দেখুন : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী; শাইখ ইদরিস কান্ধলবি, সীরাতুল মুস্তফা (সা), খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৫, ই.ফা.বা. প্রকাশিত; ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, রউফুর রহিম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯-২০, সিয়ান পাবলিকেশন প্রকাশিত)। –অনুবাদক

দ্বীনের অপব্যাখ্যাকারীরা কাফিরদের সামনে তাদের নতজানু নীতির স্বপক্ষে এ কাহিনির বিকৃত বুঝ বর্ণনা করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে আপসকামিতা। তারা কীভাবে উম্মাহকে ধোঁকায় ফেলছে, নিজেদের স্বার্থে কীভাবে এই কাহিনি ব্যবহার করছে, সেটা আমি দেখাব, ইন-শা-আল্লাহ। ভ্রান্ত নীতির স্বপক্ষে তাদের ব্যবহৃত যুক্তিগুলোও দেখাব।

শাইখ আবদুল কাদির শাইবাত ছিলেন আমার উস্তাযদের একজন। তিনি আমার বাবারও উস্তায ছিলেন। শাইখকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তার দাবি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে আপস করেছিলেন। আর ওই ব্যক্তি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে তার দাবির স্বপক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আমার বিশ্বাস যার কথা বলা হচ্ছিল, তিনি আমাদের সময়েরই ইরজাগ্রস্তদের[৩] প্রধান কেউ। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

যা হোক, প্রশ্নের উত্তরে শাইখ বললেন, কোন পাগল এই কথা বলেছে? সে তো একটা মিথ্যুক, ফাসিক, দ্বীন থেকে বিচ্যুত। সে তো জবাব পাবারও যোগ্য নয়। শাইখ তাকে ইলহাদকারীদের মতো করেই উল্লেখ করেছেন। তিনি পুনরায় বললেন, সে তো একটা মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ।

---

৩. ইরজা (الإرجاء) শব্দের অর্থ বিলম্বিতকরণ, মুলতুবিকরণ বা পৃথককরণ। যারা আমলকে ঈমান থেকে বিলম্বিত করে কিংবা বিচ্ছিন্ন করে, তাদের মুরজিয়া বলা হয়। অর্থাৎ, এরা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। মুরজিয়াদের অনেক শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। চরমপন্থী মুরজিয়াদের বিশ্বাসমতে ঈমান মানে অন্তরে জানা ও বিশ্বাস করা। আমলকে এরা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া, কুরআনকে অবমাননা করা ইত্যাদিতে লিপ্ত হলেও তাদের মতানুযায়ী কারও ঈমান বিনষ্ট হয় না। (দেখুন : ইমতাউন নাযার ফি কাশফি শুবুহাতি মুরজিয়াতিল আসর) –অনুবাদক

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে মুরজিয়াদের এসব বিশ্বাস বাতিল এবং তারাও বাতিল ফিরকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কিছু লোক আছে, যারা বিশ্বাসগতভাবে পুরোপুরি মুরজিয়া না হলেও, এদের অনেক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে ধারণ করে থাকে—যার আলামত তাদের কথা ও কাজের মধ্যে পাওয়া যায়। সতর্কতা অবলম্বনে এমন লোকদেরকে সরাসরি মুরজিয়া না বলে, ইরজাগ্রস্ত বলা নিরাপদ। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। –সম্পাদক

আমরা তার ব্যাপারে রিদ্দাহর ভয় করি। তিনি রাগান্বিত সুরে বারবার বলতে থাকলেন—সে মিথ্যুক, মিথ্যুক...। শাইখ আরও বললেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেননি।

শাইখ যা বলেছিলেন, এটাই মোটামুটি সারসংক্ষেপ। যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে ব্যবহার করে যুক্তি দেখিয়ে বলে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছেন—তাদের কথার জবাব হিসেবে এমনটাই বলা দরকার। আজ মুসলিমবিশ্বে একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা থাকলে তাদের গ্রেফতার করা হতো। তারপর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখির অপরাধে খলিফার সামনে পেশ করা হতো। এটা তো সেই অভিশপ্ত কার্টুনিস্ট ও চলচ্চিত্র নির্মাতা শাতিমের চেয়েও জঘন্য, যে বা যারা আমাদের রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহানি করেছে। পূর্ব-পশ্চিমের কিছু শাসকেরা উম্মাহকে দেওয়া ধোঁকা বৈধ করতে তাদের অফুরন্ত অর্থের যোগান দিয়েছে। আরও দিয়েছে বিভিন্ন সুবিধা, পদ ও প্লাটফরম। দ্বীনের মূলনীতির কোনো পরোয়াই তারা করছে না। এটা বৈধ করতে আবার যুক্তিও দেখাচ্ছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছেন!

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের যারা দাবি করে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছেন, তাদের এমন একজনও কি আছে, যে এ ঘটনায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দ্বীনি আত্মমর্যাদার সুরে কথা বলে? যদি তারা এ কাহিনি ব্যবহারই করে, তবে আত্মমর্যাদার সুরে কেন কথা বলে না, যেভাবে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন?

এ হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই বরং এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ়তা ও অবিচলতা—দুর্বল-সবল উভয় অবস্থাতেই সুস্পষ্ট ছিল। এ ঘটনাসহ তাঁর পুরো জীবনে—দুর্বল

CamScanner

ও সবল যেকোনো অবস্থায়, সকল কর্মেই আত্মমর্যাদাবোধ ছিল সুস্পষ্ট। মুরজিয়া, মুনাফিক, মডার্নিস্ট[৪] ও যিনদিকরা[৫] বাতিল শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন আত্মমর্যাদার সহিত কথা বলবে বা এর ওপর আমল করবে তো দূরের কথা, নিজেদের বেডরুমে পর্যন্ত এ নিয়ে কথা বলতে বা চিন্তা করতেও ভয় পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'সম্মান-মর্যাদা তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'[৬]

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন—

عزة رسوله: إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين : نصر الله إياهم على أعدائهم

'রাসুলের মর্যাদা হচ্ছে, (তাঁর আনীত) দ্বীনকে সকল দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। মুমিনদের মর্যাদা হচ্ছে, শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিজয় দান।'

নিজেদের মনমতো খাপ খাওয়াতে হুদাইবিয়ার কাহিনির বিকৃত ব্যাখ্যা-

---

৪. মডার্নিস্টরা দ্বীনের অনেক বিধানকে নিজেদের মতো কাটছাঁট করতে চায়। তারা পাশ্চাত্যের অনুকূলে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে থাকে। শরিয়াহর সবকিছুকে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের সাথে খাপ খাওয়ানোর অপচেষ্টা চালায়। এক কথায় বলা যায়, এরা আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের উপযোগী এক ইসলাম উপহার দিতে চায়। শরিয়াহর বহু বিধানকে এরা ছেঁটে ফেলে, নয়তো নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা করে। –অনুবাদক

৫. যিনদিক বাহ্যত ঈমানের দাবি করে কিন্তু নিজের কুফরকে লুকিয়ে রাখে কিংবা ইসলামের কোনো বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা দ্বীনের অকাট্য ও স্বীকৃত ব্যাখ্যার বিপরীত। যিনদিক হলো মুরতাদের এক বিশেষপ্রকার। –অনুবাদক

৬. সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮

সহ দ্বীনের মূলনীতিতে আপসের বিষয়টা একপাশে সরিয়ে রাখলেও, এ স্থায়ী বশ্যতামূলক কর্মপন্থায় তারা এক কাপুরুষ প্রজন্ম গড়ে তুলেছে। আকিদার বিষয়টিও পাশে সরিয়ে রাখলে এই প্রজন্মে তো পুরুষসুলভ কোনো গুণই নেই। আল্লাহর দ্বীন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও দ্বীনের মূলনীতিসহ হালাল-হারামের ব্যাপারে গাইরতও নেই। এক অধমুখো প্রজন্ম, যাদের বাধ্য করতে হয় না—সামান্যতম যাচাই-বাছাই ছাড়াই দেখা যাবে, আল্লাহর শত্রুদের কাছে নতজানু অবস্থায় উদরপূর্তিময় জীবনে তারা চিরাভ্যস্ত।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তারা গুরুত্বহীন করে দেখাবে। এর অর্থে বিকৃতি করবে, হালকা করে তুলে ধরবে। তাগুতের[৭] জন্য একে বৈধ করবে। তাগুতের সব কর্মকাণ্ড বৈধ করবে।

---

৭. তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরজ। তাগুতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কারও ঈমান সাব্যস্ত হয় না। 'ঈমান বিল্লাহ'র জন্য 'কুফর বিত-তাগুত' আবশ্যক। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

'আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্মে (নির্দেশনা দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।' (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৩৬)

তাগুত (طاغوت) শব্দটি এসেছে তুগইয়ান (طغيان) থেকে, যার আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি। তাগুত একটি শারয়ী পরিভাষা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته

'তাগুত হচ্ছে ওইসব মাবুদ (উপাস্য), মাতবু (যাকে অনুসরণ করা হয়) বা মুতা (যার আনুগত্য করা হয়), যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক কাওমের সে-ই তাগুত, যার কাছে

এমনিতে তো ইন্টারফেইথ[৮] হারাম—কিন্তু যখন কোনো তাগুত মক্কায় এটা শুরু করবে, তারা একে হালকা করে দেখাবে। চারপাশে গর্ত খুঁড়ে তাদের কীভাবে বের করা যায়, সে পথ খুঁজবে। মুসলিম নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে, মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চলছে, কিন্তু তাদের শাইখ বা ইমাম সাহেব বলছেন প্রতিরোধ নিষেধ! এরা তো খারিজী, এরা এরই প্রাপ্য!

আসলে তাদের মাঝে বিন্দু পরিমাণ গাইরত বা পুরুষত্বও নেই। আর তাদের আকিদার গোমরাহির কথা তো বাদই থাকল। আত্মমর্যাদা আমাদের দ্বীনের জরুরি একটি বিষয়। 'اَلْعِزَّةُ'-ইযযাত (অর্থাৎ, মর্যাদা বা সম্মান) এটা-সহ এ থেকে আগত বিভিন্ন শব্দ কুরআনে প্রায় একশত চল্লিশ বার এসেছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করা হয় অথবা আল্লাহর দেখানো পথের বিপরীতে যার আনুগত্য করা হয়, কিংবা যার আনুগত্য এমন বিষয়ে করা হয়, যা আল্লাহর আনুগত্য বলে তারা জানে না। এরাই হলো পৃথিবীর তাগুত। এদের ব্যাপারটা এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে তাগুতের ইবাদাতে লিপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালা বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে দ্বারস্থ হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ বাদ দিয়ে তাগুতের আনুগত্য ও অনুসরণে লিপ্ত।' (ইলামুল মুআক্কিয়িন : ১/৫৩)। (দেখুন : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব, রিসালাতুন ফি মানাত-তাগুত; শাইখ আবুল হাসান আলি নাদবি, দ্বীনে হক আওর উলামায়ে রাববানি শিরক ও বিদআত কে খিলাফ কিউঁ (দরসে তাওহীদ : তাওহীদের চার প্রতিপক্ষ) –অনুবাদক

৮. ইন্টারফেইথ অর্থ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সম্প্রীতি। ইন্টারফেইথের আদর্শ হচ্ছে 'সকল ধর্ম সমান', 'সব ধর্মকেই সম্মান করতে হবে' ইত্যাদি। ইন্টারফেইথ নির্জলা হারাম ও কুফর। (দেখুন : ইসলামকিউএ, ফাতওয়া নং : ১০২১৩) –অনুবাদক

অধ্যায় দুই

আপসকামিতা

অনেকে সত্যের পথের কঠিন বাস্তবতা শেখেনি। তারা মনে করে হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের সেই আঁকাবাঁকা পথ। তাই তারা একে নিজেদের ব্যর্থতা, কাপুরুষতা ও নড়বড়ে অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করায়। সবকিছুতেই মাসলাহার[৯] দরজা খুলে দিতে তারা একে ঢাল হিসেবে

---

৯. 'মাসলাহা' শব্দের অর্থ কল্যাণ। উসুলুল ফিকহে 'মাসালিহ মুরসালাহ' নামক একটি পরিভাষা রয়েছে। অনেকে এর দোহাই দিয়ে শরিয়াহর মাঝে কাটছাঁট করতে প্রয়াস পান। এ বিষয়টা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। 'মাসালিহ মুরসালাহ'র অর্থ গণকল্যাণ বা জনস্বার্থ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

المصالح المرسلة : هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه

'মাসালিহ মুরসালাহ হলো, মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো কাজ সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তা প্রবল কল্যাণকর এবং শরিয়াতের মাঝে এর পরিপন্থী কোনো দলিল নেই।' (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩)। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ'র কথা স্পষ্ট। শরিয়াহবিরোধী কিছুতে দ্বীনের কল্যাণ নেই, মুসলিমদের স্বার্থ নেই। আর তার ওপর যদি বিষয়টা দ্বীনের মূলনীতি, আকিদা ও তাওহিদ নিয়ে হয়, তখন তো আরও ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মূলত তাওহিদ ও আকিদাই সবচেয়ে বড় মাসলাহা, সবচেয়ে বড় মাসালিহ মুরসালাহ। অধুনা দ্বীনের বিভিন্ন বিধানকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য বিভিন্নভাবে কেটেছেঁটে যুৎসই উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর এটা করতে গিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে 'মাসালিহ মুরসালাহ', 'মাকাসিদুশ শরিয়াহ' নামক প্রভৃতি পরিভাষাগুলো। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। (দেখুন : ড. আহমদ আলী,

ব্যবহার করে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র ব্যাপারটি হালকা করে তুলে ধরা এবং দ্বীন ও তাওহিদের মূলনীতিতে আপস করতেই এর ব্যবহার করে তারা। গণতন্ত্রের শির্ককে আলিঙ্গনসহ আল্লাহর শরিয়াহ পরিবর্তন করে মানবরচিত কুফরি সংবিধান বৈধ করতেও তারা এর ব্যবহার করে। সাধারণত কাফিরদের সাথে কিছু নির্দিষ্ট চুক্তিকে বৈধ করতে এর ব্যবহার তো করেই, সেই সাথে তাগুতের স্বপক্ষে তাওহিদবাদীদের বিরুদ্ধে সেসব চুক্তিকে বৈধ করতেও এর ব্যবহার করে। পশ্চিমাদের সন্তুষ্টির জন্য কিংবা তাগুতের সীমালঙ্ঘনকে জোড়াতালি দিতেও এর ব্যবহার করে তারা।

এভাবে কাটছাঁট করে নয়, বরং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আমাদের এই দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?'[১০]

অর্থাৎ, তুমি কি কিতাবের কিছু অংশ মানো আর বাকি অংশ অস্বীকার করো? আয়াত, হাদিস বা সীরাতের কিছু অংশ খেয়ালখুশি মতো বাছাই করা যাবে না। শুধু যে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবেই ধারণ করতে হবে তা নয়, হুদাইবিয়ার কাহিনির বিভিন্ন দিকও সামগ্রিকভাবে নিতে হবে। কিন্তু তারা একে টুকরো টুকরো করেই থামেনি—টুকরোগুলোর অর্থেও বিকৃতি এনেছে। প্রসঙ্গ ছাড়াই ব্যবহার করেছে। যুক্তি দেখিয়েছে যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছেন। বিকৃত বুঝের প্রেক্ষিতে এমন ভুল যুক্তির মাধ্যমে তারা মূলত দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করার দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

তুলনামূলক ফিকহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫০; ইসলামকিউএ, ফাতওয়া নং : ১৬০৮৭৬) –অনুবাদক

১০. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৫

মূলত এই কাহিনিতেই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মমর্যাদার প্রমাণ রয়েছে। এই কাহিনির ছয় বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক। মদিনায় এক উম্মাহর গোড়াপত্তনের পর এটা সংঘটিত হয়। এর আগে তিনি মক্কায় ছিলেন দুর্বল ও সংখ্যালঘু।

সাহাবায়ে কেরামকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে নিজদেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এরপর তিনি তোমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, নিজ সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের শক্তি দিয়েছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছেন, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।'[১১]

মাক্কীজীবনে সাহাবিরা ছিলেন সংখ্যালঘু ও নির্যাতিত। তাঁরা প্রতিনিয়তই ভয়ে থাকতেন কখন যে, আক্রমণ করা হয় বা কেউ তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়! রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবিরা কুরাইশদের চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে হয়েছেন নির্যাতিত। এতকিছুর পরও যেখানে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দু পরিমাণ আপস করেননি, আর উম্মাহপ্রতিষ্ঠা ও সামরিক শক্তি অর্জনের পর বুঝি তিনি দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করতে যাবেন? যখন তিনি একাই এক উম্মাহ থাকা অবস্থায় পুরো পৃথিবীর মোকাবিলা করেছেন, তখন আপস করেননি; আর হুদাইবিয়ার সন্ধির সেই মুহূর্তে তো চৌদ্দশ' সাহাবি তাঁর জীবনরক্ষার জন্য জান কুরবানে প্রস্তুত, এ সময়

১১. সূরা আল-আনফাল, ৮ : ২৬

বুঝি তিনি আপসে যাবেন? তিনি যে শুধু দুর্বল সময়ে দ্বীনের মূলনীতিতে আপসহীন ছিলেন তা-ই নয়, বরং একই সাথে দ্বীনের মূলনীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেও কখনো পিছপা হননি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

'তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে (জেনে রাখুন) তারাও নমনীয় হবে।'[১২]

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আপসের জন্য তাঁকে লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়েছে। কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে তাঁকে চুপ থাকতে বলেছে। এটা মক্কার দুর্বল অবস্থার সময়কার কথা। তখন তিনি তাদের কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। এসব প্রস্তাবে সহমর্মী হওয়া কিংবা কোনো ধরনের আপসে যাওয়ার ব্যাপারে কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাবধান করেছেন—

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোনো নির্দেশ থেকে বিচ্যুৎ না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন।'[১৩]

তাদের প্রস্তাবনা ছিল, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর কিছু মূলনীতি পরিত্যাগ করতেন, তবে তারাও কিছু পরিত্যাগ করত; এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

১২. সূরা আল-কলাম, ৬৮ : ০৯

১৩. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৯

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

'(হে প্রিয় নবী, আপনি বলুন) হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যার ইবাদাত করো আমি ইবাদাত করি না।'[১৪]

আয়াতের মানে হচ্ছে—কথা, কাজে এমনকি নীরব থেকেও দ্বীনের কোনো কিছুতে ছাড় দিয়ো না। দীপ্তকণ্ঠে সত্যের ঘোষণা দাও। নীরব থেকেও আপস কোরো না। ইমাম আস-সা'দী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—মুশরিকরা অনুরোধ করে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাদের উপাস্যদের ত্রুটির ব্যাপারে নীরব থাকেন, তাহলে তারাও তাঁর ব্যাপারে চুপ থাকবে। এ প্রস্তাব তারা তখন দিয়েছিল, যখন বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার রদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের লোকেরা মক্কার প্রখর রোদে চাবুকাঘাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন।'[১৫]

ইমাম কুশাইরী রহিমাহুল্লাহ বলেন— এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তাঁর নিয়ামাত পূর্ণ করেছেন। তিনি কখনোই তাদের দিকে ঝুঁকে যাননি। আল্লাহ তাঁকে বাতিলের সাথে যেকোনো ধরনের আপস থেকে হিফাজত করেছেন।

مداراة-'মুদারাহ'-কে مداهنة-' মুদাহানাহ'-এর সাথে মেশানো যাবে না।

مداراة (মুদারাহ) হলো কোমল হওয়া। দাওয়াতের জন্য কোমল হওয়া। যেমন, কাফির আত্মীস্বজনের সাথে রহমদিল হওয়া।

---

১৪. সূরা আল-কাফিরুন, ১০৯ : ১-২

১৫. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭৪

مداهنة (মুদাহানাহ) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপস করা, নতিস্বীকার করা।

ইবনু বাত্তাল আল-মালিকীর মতো ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, مداراة-'মুদারাহ' হলো সুন্নাহ, বরং এটা প্রশংসনীয়; আর مداهنة-'মুদাহানাহ' হারাম ও নিন্দনীয়। একটি হলো আল-ফিকহুল আকবার—তাওহিদ। এর ওপর আগেই দারস হয়েছে।[১৬] আরেকটি হলো আল-ফিকহুল আসগার, যেমন 'ফুরুউল ফিকহ'—যার দারস চলমান।[১৭]

অপব্যাখ্যাকারীরা তৃতীয় আরেক প্রকারের ফিকহ উদ্ভাবন করেছে। এরা এর শিক্ষা দেয়। ফিকহুল ইনবিতাহ (فقه الانبطاح)। এটা হলো এমন ফিকহ—যার মাধ্যমে এরা শেখায় উম্মাহকে কীভাবে শুধু এমন কাপুরুষ বানানো যায়, যারা মূলনীতিতে আপস করে। কীভাবে আকিদায় বশ্যতাস্বীকার করা যায়, এই ফিকহ সেটাই শেখায়। আল্লাহর প্রতিটা শত্রুর কাছে কীভাবে নতজানু হয়ে উদরপূর্তিময় জীবনে ডুবে থাকা যায়, তা শেখায়। কাফিররা সমালোচনা করে, এমন আকিদায় আপস করতে শেখায়। সমালোচনা না করলেও আকিদার প্রতিটি দিকের ব্যাপারেই আপস করতে শেখায়। আল্লাহর শত্রুরা যেভাবে চায় সেভাবে দর্জির মতো ইসলামকে কেটে মাপমতো পোশাক বানাতে শেখায় এই ফিকহ।

১৬. যেমন, *Tawheed Series - Sharh Usool ath-Thalatha* ও *Sharh al-Aqeedah at-Tahawiyyah Series*।

১৭. *Explanation of Furū' Al-Fiqh Series*

অধ্যায় তিন

মর্যাদাপূর্ণ বাইয়াত

অপব্যাখ্যাকারীরা দ্বীনের ব্যাপারে বশ্যতাস্বীকার করে। হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছু টুকরো বিষয় মনমতো বেছে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এরা। প্রশ্ন হচ্ছে, হুদাইবিয়ার চারবছর আগে যে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পুরুষ ও একজন নারীর ওপর সীমালঙ্ঘনের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, সেটা কেন তারা কখনো ব্যবহার করে না?[১৮] আর

১৮. দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাস। এক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকার বাজারে দুধ বিক্রি করতে আসেন। বিক্রিশেষে এক স্বর্ণকারের দোকানে যান। দোকানের ইয়াহুদিরা মহিলার নিকাব খুলতে বললে তিনি খুলতে অস্বীকৃতি জানান। এ দিকে ওই স্বর্ণকার গোপনে মহিলার কাপরের এক কোণ পিঠের সাথে বেঁধে দেয়। বসা থেকে উঠতে গেলে ওই মুসলিম মহিলার সতর উন্মুক্ত হয়ে যান। এতে উপস্থিত ইয়াহুদিগুলো হো হো করে হাসতে থাকে। মহিলা লজ্জায় আর্তনাদ করতে থাকেন। তা শুনে এক মুসলিম ওই স্বর্ণকারকে হত্যা ফেলে। প্রতিশোধস্বরূপ ইয়াহুদিরাও ওই মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে। নিহত মুসলিমের পরিবার ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ডাকতে থাকে। পরিবেশ উত্তপ্ত ও উত্তেজনামুখর হয়ে যায়। খবর পেয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির-আনসারদের সমন্বিত একদল যোদ্ধা নিয়ে উপস্থিত হন। এটাই বনু কাইনুকার যুদ্ধ নামে পরিচিত। (দেখুন : শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতুম; ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, রউফুর রহিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৪, সিয়ান পাবলিকেশন প্রকাশিত)। তবে এ ঘটনার বর্ণনা সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে তাহকিক চাইলে বন্ধুবর উস্তায শাইখুল ইসলাম হাফিযাহুল্লাহ জানান, 'ইবনু হিশাম একটি সনদ উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদে দুইজন রাবির নাম রয়েছে। একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনু জাফার (মৃত্যু : ১৭০ হিজরি)। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের উস্তায। তাঁর কাছ থেকে ইবনু হিশাম কোনো

হুদাইবিয়ার ক'বছর পর যে তৎকালীন পরাশক্তির বিরুদ্ধে দূত হত্যার জন্য বাহিনী পাঠান, সেটা কেন তাদের ব্যবহার করতে শোনা যায় না?[১৯]

শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী। *'আর-রাহিকুল মাখতুম'* গ্রন্থের লেখক। আমার খুব ভালো করেই মনে আছে যে, তিনি কোনো এক এপার্টমেন্টের একটি নিম্ন পর্যায়ের বেডরুম ভাড়া নিয়ে কিছু কন্সট্রাকশন শ্রমিকসহ থাকতেন। সেই পরিবেশ এবং সেখানে গেলে যেই ম্যাট্রেসের ওপর আমরা বসতাম, সেসবের কথা আমি ভুলিনি। একবার শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী সীরাহ পড়ানোর সময় মুতার যুদ্ধে এসে থেমে যান এবং কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মুসলমিরা যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তার মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল এটি। তিনি কিছু শহিদ সাহাবির নামও বলেন, যারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত রাষ্ট্রদূত হারিস ইবনু উমাইর আল-আজাদী রদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে সংঘটিত এ যুদ্ধে শহিদ হন।

যা হোক, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতে হুদাইবিয়ার এই সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছিলেন। আর আজকের যুগের অপব্যাখ্যাকারীরা এই সন্ধিকে অন্তর ও ময়দানে ইসলামকে দুর্বল করতে ব্যবহার করছে।

মুতা যুদ্ধের আগে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। একটি চিঠি তিনি

বর্ণনা করেননি। উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এর মানে উভয়ের মধ্যবর্তী রাবিগণ সনদ থেকে বাদ পড়েছেন। তাই সনদটা মুআল্লাক (দয়িফের একটা প্রকার)। ২য় রাবি হলেন, আবু আওন (মৃত্যু : ১১৬ হিজরি)। তিনি শেষ স্তরের তাবিয়ি। তিনি বনু কাইনুকার ঘটনা পাননি। অথচ নিজেই বর্ণনা করছেন সেটা! তাই, এটা মুরসালও। পাশাপাশি আবু আওন হলেন একজন 'মাজহুলুল হাল' রাবি তথা হাদিস-বর্ণনায় তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত। এটাও দয়িফের আরেকটা কারণ।' –অনুবাদক

১৯. মুতার যুদ্ধ ৮ম হিজরিতে সংঘটিত হয়। আর হুদাইবিয়ার সন্ধি হয় ৬ষ্ঠ হিজরিতে। অর্থাৎ ব্যবধান দুই বছর। –অনুবাদক

আল-বালকার এক নেতা—যিনি বসরা শহরের গভর্নর ছিলেন—তার কাছেও পাঠান। সে মূলত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য কর্তৃক নিয়োগকৃত ছিল। সে হারিস ইবনু উমাইর আল-আজাদীকে গ্রেফতারের পর হত্যা করে ফেলে। এ খবর পেয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সামান্য গভর্নরের পেছনে থাকা বিশাল পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

আজ অপব্যাখ্যাকারীরা মাসলাহা (কল্যাণের পরিভাষা) ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে ঠিক সেটারই সমালোচনা করছে, যা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। তারা বলে, শত্রুরা তো খুবই শক্তিশালী। এদিকে আমরা খুবই দুর্বল এবং সংখ্যালঘুও। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তো আসলে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দুর্বল ছিলেন। তবে আল্লাহর ওপর তাঁর পূর্ণ ইয়াকিন ছিল। যখন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন তাঁর সাহাবি হারিস ইবনু উমাইরকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে, সংবাদটি খুবই কঠিন ছিল তাঁর জন্য। বিলম্ব না করে তিনি সাহাবিদের বাহিনী প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। সাহাবায়ে কেরামও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তিনহাজার তাওহিদের অনুসারীর বিপরীতে বিশাল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুই লক্ষ সেনা! সব সাহাবায়ে কেরাম শুধু একজনের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। এসব পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তো এটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কেন তারা সবসময় হুদাইবিয়াকে কাজে লাগায়, এর উদ্দেশ্যকে ভিন্নখাতে ব্যবহার করে? অথচ, তারা কখনো মুতা যুদ্ধের ইতিহাস উল্লেখই করে না!

এ যুগে একজন-দুজন নয়, অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা ও বন্দি করা হয়েছে। তাদের ভূমি দখল করা হয়েছে। তাদের এই দ্বৈতনীতি কি চোখে পড়ছে না?

দ্বীনি আত্মমর্যাদা-সংবলিত এসব ঘটনা হুদাইবিয়ার আগে-পরেসহ

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে দুর্বল-সবল বিভিন্ন পরিস্থিতিতেই ঘটেছিল। অজুহাতের বিন্দুমাত্র জায়গা আর থাকে না। তারা যদি এসব ঘটনা ব্যবহার করতে না চায়, তবুও স্বয়ং হুদাইবিয়া সন্ধির অবিচ্ছেদ্য দিকগুলো তো আর বাদ দিতে পারবে না। হুদাইবিয়ার কাহিনিতেই রয়েছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু লড়াইয়ের মর্মে সাহাবায়ে কেরামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

'মুমিনরা যখন গাছটির নিচে আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি তাদের মনের কথা জানতেন। তাই, তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাদের দান করেন এক নিকটবর্তী বিজয়।' [২০]

আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ

'গাছের নিচে বসে বাইয়াতকারীদের একজনও জাহান্নামে যাবে না, ইন-শা-আল্লাহ।' [২১]

অর্থাৎ এখানে হুদাইবিয়াতে বাইয়াতকারী সাহাবিদের কথা বলা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত ও বিশুদ্ধ মত এটাই যে— সাহাবায়ে কেরাম আমৃত্যু লড়ে যাবেন—এ মর্মে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইয়াত দেন।

---

২০. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১৮

২১. সহিহ মুসলিম : ৬২৯৮

আর এটাই সেই সন্ধি, যা দিয়ে তারা দ্বীনের মূলনীতিতে বশ্যতাস্বীকারের দলিল চিত্রিত করে থাকে।

রটে গিয়েছিল যে, উসমান রদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। সীরাতের বইগুলোতে এটা বহুল প্রচারিত। তবে এই ঘটনা সহিহ সূত্রে বর্ণিত নয়। কারণ যা-ই হোক, সাহাবায়ে কেরামের জন্য আপস ও নতিস্বীকারের চিত্র আঁকা হয়েছে—অথচ, তাঁরাই কি না যুদ্ধ ও জান কুরবানের বাইয়াত দিয়েছিলেন। দ্বীনের ব্যাপারে আপস বৈধ করতে যারা এই ঘটনাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে, তারা কি এভাবে চিন্তা করে দেখে? তাদের কি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এ ধরনের গাইরত আছে?

সালামা ইবনু আকওয়া রদিয়াল্লাহু আনহুর কুনিয়াত ছিল আবু মুসলিম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—

يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ

'হে আবু মুসলিম, সেদিন আপনারা কোন জিনিসের ওপর বাইয়াত করেছিলেন?'

তিনি বললেন,

عَلَى الْمَوْتِ

'মৃত্যুর ওপর।'[২২]

এতে প্রমাণ হয় কেউ কেউ মৃত্যুর প্রতিশ্রুতির বাইয়াত দিয়েছিলেন। আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বাইয়াত গ্রহণও করেন। অথচ, দেখা যাবে দ্বীন ধ্বংসে চেষ্টারত কিছু মানুষ বলছে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছিলেন। জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

২২. সহিহ বুখারী : ২৯৬০

لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا
بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ

'আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মৃত্যুর শপথ গ্রহণ করিনি। আমরা তো তাঁর কাছে এ মর্মে শপথ করেছি যে, আমরা পিছু হটব না।'[২৩]

'সহিহ মুসলিম'-এ একই ধরনের বক্তব্য মাকিল ইবনু ইয়াসার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত রয়েছে। ইমাম ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্থের দিক থেকে সবগুলো বর্ণনা একই। তিনি বলেছেন, মৃত্যু বা পিছু না হটা কিংবা সবরের বাইয়াত মূলত একই। কারণ, মৃত্যুর বাইয়াত মানেই তো আশপাশের লোকেরা শহিদ হলেও পিছু না হটা। আর এটাও জরুরি নয় যে, মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তিনি এও বলেছেন, এই বর্ণনা *'সহিহ বুখারী'*র ওই বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে এসেছে সাহাবায়ে কেরাম সবরের শর্তে বাইয়াত দিয়েছিলেন। কারণ, সবর মানে মৃত্যুর পরিস্থিতি সামনে এলেও অটল থাকা, পিছু না হটা।

এখানে কি দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ লক্ষ করা যায় না? রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সাহাবায়ে কেরামকে এই ভয় দেখিয়েছিলেন যে, শত্রুপক্ষ কত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর? যারা হুদাইবিয়াকে দ্বীনের ব্যাপারে আপসের জন্য ব্যবহার করে, আল্লাহর দ্বীনকে বিক্রি করতে বিভিন্ন চুক্তিতে সাক্ষর করে, তাদের ব্যাপারে ভাবুন। আপনি কি দ্বীনের ব্যাপারে কখনো তাদেরকে এমন এমন আত্মমর্যাদার সুরে কথা বলতে শুনেছেন?

২৩. সহিহ মুসলিম : ৪৭০২

অধ্যায় চার

ইয়াহুদিজাত বৈশিষ্ট্য

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আরও মর্যাদাবোধের ব্যাপার রয়েছে। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়ছিল যে, মক্কাবাসী তাঁকে কাবায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবরটা তাঁর কাছে এসেছিল এভাবে—

إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْأَحَابِيْشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوْكَ

'কুরাইশরা বিরাট দল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দেবে, ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।'[২৪]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছিলেন, শুনুন। তিনি বলেছিলেন—

---

২৪. সহিহ বুখারী : ৪১৭৮

أَشِيرُوْا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيْلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ

'হে লোক-সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যারা আমাদের বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?'[২৫]

এখানে পুরো ব্যাপারটাই আত্মমর্যাদাবোধে পরিপূর্ণ। অথচ এই কাহিনিকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়, যেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত হয়েছিলেন অথবা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করেছিলেন।

যারা একদম স্থায়ী বশ্যতাস্বীকার বা আপস করাকে সঠিক মানহাজ মনে করে, তাদের সামনে যদি নাম উল্লেখ না করে উল্লিখিত হাদিসের বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়, তবে তারা সেই লোককে কী আখ্যা দেবে? এটাই মুসলিমদের বলে দিচ্ছে কে হক, আর কে বাতিলের ওপর রয়েছে।

যা হোক, সাহাবিদের উদ্দেশ্যে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের জবাবে আবু বাকর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيْدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তো বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারও সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো আসেননি। তাই বাইতুল্লাহর দিকে চলুন। যে আমাদের বাধা দেবে আমরা তার সাথে লড়াই করব।'[২৬]

---

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. প্রাগুক্ত

আগেই বলেছি, হুদাইবিয়ার সন্ধিতেই বহু মর্যাদাপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এটিও আরেকটি উদাহরণ।

উত্তেজনা বাড়তে থাকলে মধ্যস্থতা করার জন্য বুদাইল ইবনুল ওয়ারাকা আল-খুযায়ি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا

'আমি তো কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, বরং উমরাহ করতে এসেছি। যুদ্ধ তো কুরাইশদের দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে। যদি আমি তাদের ওপর বিজয় লাভ করি, তাহলে অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে। আর না হয় তারা এ সময়ে শান্তিতে থাকবে।'[২৭]

দেখুন, এরপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলছেন—

وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ

২৭. সহিহ বুখারী : ২৭৩১

'কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—আমার গর্দান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আর আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই।'[২৮]

তিনি সেই লোককে কথাগুলো বলেছেন, যে ছিল কুরাইশদের পাঠানো দূত। সে বলল,

سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ

'আমি আপনার কথা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবো।'

রাসুল রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা কি আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে আপসকারীদের মতো শোনাচ্ছে? আজকের সময়ে কারা এ স্বরে কথা বলে? আজকে কারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এমন আত্মমর্যাদার সুরে কথা বলে?

জেনে রাখুন, তাওহিদবাদীরাই এভাবে বলে। যারা দ্বীনের মূলনীতিতে আপসের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য এই কাহিনিকে ব্যবহার করে, তাদেরকে কি এভাবে বলতে শোনা যায়? মূলত তাদের বৈশিষ্ট্যটা ইয়াহুদিদের মতো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো, আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?'[২৯]

যে অংশে তারা বিশ্বাস করে সেটার অর্থও বিকৃত করে, নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে।

---

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৫

সন্ধির মাধ্যমে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে আকিদা ও জনবলসহ সবদিকে শক্তিশালী করা। আর আজকের যুগে সন্ধির নকশা করা হয় উম্মাহকে আকিদা, সম্পদ ও ভূমিসহ সবদিক থেকে দুর্বল করার জন্য। আজকে তারা সাময়িক যুদ্ধবিরতি ও আপস করছে বশ্যতাস্বীকার ও মুসলিমদের অন্তরে তাওহিদকে দুর্বল করার জন্য। তারা এটা করছে কাফিরদের কাছে মুসলিমদের নত করার জন্য। উম্মাহর সম্পদ ও সামরিক শক্তিকে সর্বোচ্চ উপায়ে দুর্বল করার জন্য তারা এ ধরনের আপস করছে। তারা এই আপস ও সাময়িক চুক্তিতে প্রবেশ করছে আল্লাহর নেককার তাওহিদবাদী বান্দাদের ধরপাকড় করার জন্য।

আল্লাহর দ্বীনে 'যৌক্তিক মধ্যস্থতা' বলে কোনো নাটক চলবে না। অপব্যাখ্যাকারীদের এই চুক্তি ও আপস সুস্পষ্ট পরাজয়। অপরদিকে হুদাইবিয়ার চুক্তিকে আল্লাহ বলছেন 'ফাতহুম মুবিন' অর্থাৎ, সুস্পষ্ট বিজয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

'আমি তোমাকে দিয়েছি এক সুস্পষ্ট বিজয়।'[৩০]

আজকের যুগের চুক্তি ও আপস হলো অপদস্থতা ও সুস্পষ্ট পরাজয়। দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট বিজয় বলেননি। এ প্রসঙ্গে বারা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ

'হুদাইবিয়ার বাইআতুর রিদওয়ানকে আমরা প্রকৃত বিজয় মনে করি।'[৩১]

---

৩০. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ০১

৩১. সহিহ বুখারী : ৪১৫০

ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির চেয়ে বড়ো কোনো প্রকাশ্য বিজয় নেই। এর পরবর্তী দুই বছরে আগের চেয়েও বেশি-সংখ্যক লোক ইসলামে প্রবেশ করে। ইবনু হিশাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হুদাইবিয়াতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়েছিলেন চৌদ্দশ' জন, আর দুই বছর পর মক্কা-বিজয়ের সময় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যান দশ হাজার সাহাবি।'

আজকের যুগের বশ্যতামূলক চুক্তিগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করুন। সব জায়গায় যে পরিমাণ ছাড় আজ তারা দিয়েছে—এমন একটা উদাহরণ দেখান, এটা কোনোভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করেছে অথবা মুসলিমদের জান-মালের হিফাজত করছে, উম্মাহর হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনছে কিংবা অন্য কোনো উপকারে এসেছে।

আর হুদাইবিয়ার সন্ধি উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল। তা এতই কল্যাণকর ছিল যে, আল্লাহ একে ফাতহুম মুবিন বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের বশ্যতাস্বীকারের মানহাজ, মূলনীতিতে আপস—উম্মাহর জন্য এমন কী কল্যাণ বয়ে এনেছে? প্রতিটা স্তর ও জায়গায় বয়ে এনেছে আরও পরাজয়, আরও অপমান। এনেছে আরও রক্তপাত, পশ্চাদপসরণ। উম্মাহকে করেছে আরও দুর্বল। সবচেয়ে গুরুতর হলো, উম্মাহর মাঝে এনেছে আকিদার বিপর্যয়।

অধ্যায় পাঁচ

আসমানি সিদ্ধান্ত

হুদাইবিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যাকারী যেসব যুক্তি পেশ করে, সেসবের কিছু ব্যাপক ও কিছু বিশেষ খণ্ডন রয়েছে। নির্দিষ্ট বা বিশেষ খণ্ডন নিয়ে আলোচনা করা যাক। চুক্তি খসড়া তৈরি হবার সময়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রদিয়াল্লাহু আনহুকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লিখতে বললেন। কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনু আমর বলল,

أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ

'আল্লাহর কসম, রহমান কে আমরা তা জানি না; বরং আগে যেমন লিখতেন, তেমনই লিখুন 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'।'[৩২]

সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

---

৩২. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

وَاللهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'আল্লাহর কসম, আমরা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' ছাড়া অন্য কিছু লিখব না।'

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ

'লেখো—বিসমিকাল্লাহুম্মা।'[৩৩]

বিষয় হচ্ছে, তারা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' না লিখে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখতে চেয়েছে আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা মেনেও নিয়েছেন—কারণ, মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে দুটোই সংগত ও গ্রহণযোগ্য। দুজন চিঠি লিখলে একজন শিরোনামে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লিখল এবং অন্যজন 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখল—এতে তো কোনো সমস্যা নেই। এখানে কি দ্বীনের মূলনীতিতে কোথায় আপস করা হচ্ছে? আল্লাহর কোনো নির্দিষ্ট নাম ও গুণকে বাছাই করা কি ওয়াজিব? রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহর এই দুটো গুণকে অস্বীকার করেছিলেন? তিনি কি কখনো 'আর-রহমান' ও 'আর-রহিম'কে অস্বীকার করেছিলেন? রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদের কোনো মূর্তির নাম মেনে নিয়ে শির্কের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি কি তাদের কোনো মূর্তির নামে লেখা শুরু করতে বলেছিলেন, যাতে তাদের স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে? এগুলোর কোনোটাই হয়নি। আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো কখনোই করতেন না। প্রকৃতপক্ষে কুরাইশরা এসব করতে কোনো আবদারও করেনি।

---

৩৩. প্রাগুক্ত

এরপর কুরাইশরা 'রাসুলুল্লাহ' শব্দের ব্যাপারেও আপত্তি জানায়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লিখতে নির্দেশ দিলেন,

هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

'এটা (হলো, সেই চুক্তিপত্র) যার ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[৩৪]

সুহাইল বলল,

وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

'আল্লাহর কসম, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে তো আপনাকে কাবা যিয়ারত করতে বাধা দিতাম না, আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না; বরং আপনি লিখুন, "আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ'।'[৩৫]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي. اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

'আল্লাহর কসম, তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করলেও আমি আল্লাহর রাসুল। লেখো "আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ'।'[৩৬]

যদি তিনি রাসুল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতেন, তবে এটা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস হতো।[৩৭] ব্যাপারটা লিখতেই হবে—এমন নয় বলেই

---

৩৪. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. কিংবা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন কিছুও বলতেন, যার দ্বারা তাঁকে রাসুল

তিনি 'রাসুলুল্লাহ' লেখার ব্যাপারে আর জোরাজুরি করেননি। ব্যাপারটি আর-রহমান আর-রহিমের মতোই। বিশ্বাসের অংশ হিসেবে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি লিখিত থাকা জরুরি নয়। তাই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি লিখিত থাকার বিষয়টিকে এত জরুরি মনে করেননি। বিয়ের উদাহরণই ধরা যাক। কারও বিয়ে হলো কিন্তু লিখিত থাকল না, এতে কি বিয়ে নাকচ হয়ে যায়? যে ইমাম বিয়ে পড়ালেন তিনি লেখেননি বলে এটা কি যিনায় লিপ্ত থাকা হবে?

দেখুন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে বিষয়টি সাব্যস্ত করলেন, ঘোষণা দিলেন। তিনি সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখেননি। তিনি বলেছেন,

وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي. اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

'আল্লাহর কসম, তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করলেও আমি আল্লাহর রাসুল।'

পাঠ্যসূচি থেকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' ছেঁটে ফেলার সময় তারা কি কাফিরদের বলে যে, আমরা তোমাদের থেকে বারাআত করছি কিন্তু বইপত্রে লিখছি না? না, বরং তারা পাঠ্য বই থেকে ছেঁটে ফেলার সাথে সাথে অন্তর থেকেও মুছে দিতে প্রচেষ্টা চালায়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মদিনায় ফিরে গিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করছিলেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ নন?

তারা অভিধান থেকে কুফর ও কাফির শব্দগুলো বাদ দিয়ে, তারপর

হিসেবে কাফিরদের অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো সুর বা ইঙ্গিত থাকতো অথবা তিনি যদি এ বিষয়ের কিছুই না বলে, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ' লেখার ব্যাপারে সম্মতি দিতেন, তাহলেও হয়তো আপসকামীরা এটাকে দলিল হিসেবে লুফে নেওয়ার সুযোগ পেতো। কিন্তু নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সুহাইল ইবনু আমরের কথার প্রেক্ষিতে দীপ্তকণ্ঠে স্বীয় রিসালাতের ঘোষণা দিয়েছেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ' লেখার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং, এখানে আপসকামীদের স্বপক্ষে লেশমাত্র কোনো দলিলও নেই। —সম্পাদক

'ছ্টারফেইথ' শিক্ষা দেওয়া শুরু করে। যাদের সাথে বারাআত করতে হবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক রাখে, আর যারা ওয়ালা পাবার যোগ্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। তারা আন্তরিকভাবেই দ্বীনের মূলনীতিতে ছাড়পন্থা অবলম্বন করে। উদাহরণ হিসেবে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে ব্যবহার করে। আমি নিজ থেকে এগুলো বলছি না। উলামায়ে কেরাম—যেমন আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী, ইমাম নববী, কাযী ইয়ায-সহ প্রমুখ ইমামগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তাঁরা একেকজন বিভিন্নভাবে বলেছেন, কিন্তু সবার কথার মর্মার্থ একই। তাঁরা যা বলেছেন, সেগুলোর সারমর্ম হলো— রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ' ও 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' শব্দদুটো মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, এগুলো আর-রহমান ও আর-রহিমকে বাতিল করে না। এও বাতিল করে না যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (অর্থাৎ, আল্লাহর রাসুল)। তাঁরা বলেছেন, রহমান-রাহিম আল্লাহর এ নামগুলোসহ 'রাসুলুল্লাহ' না লেখাটা দ্বীনের কোনো ক্ষতি নয়। এটা আল্লাহর হককেও লঙ্ঘন করে না।

ইমাম ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একে 'مداراة' (মুদারাহ) বলা হয়। আর এর দ্বারা শরিয়াহ লঙ্ঘন হয় না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ কাজই করেছেন। তিনি এও বলেছেন, বরং 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'তে তো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-এর অর্থ পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর বাবার সাথে তাঁর নাম জুড়ে দেওয়া—অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ' লেখা তাঁর রাসুল হওয়াকে নাকচ করে না। সুতরাং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ বিষয়েরই সম্মতি দিয়েছিলেন।

যা হোক, এরপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ

'এ চুক্তি করো যে, তারা আমাদের ও কাবার মাঝে কোনো

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না—যেন আমরা নির্বিঘ্নে তাওয়াফ করতে পারি।'

সুহাইল বলল,

وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

'আল্লাহর কসম, আরববাসীরা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাবগ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে; তাই বরং সেটা আগামী বছর হতে পারে।'[৩৮]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা মেনে নিলেন। এখানে কি দ্বীনের মূলনীতি বা আকিদায় কোনো আপস করা হয়েছে? এটি কোনো আকিদা বা উসুলগত বিষয় নয়, বরং এটি তো ফিকহী বিষয় যে, দরকারে কোনো ব্যক্তি কীভাবে তার উমরাহ বা হজ না করেও ফিরতে পারবে।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি যুবাআ বিনতু যুবাইর দিয়ে শুরু করেন। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি হজ করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ভয় করছিলেন হজ শেষ করতে পারবেন না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, 'তুমি হজের নিয়াতে বেরিয়ে যাও এবং এই শর্তারোপ করে আল্লাহর কাছে বলো,

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِ

'হে আল্লাহ, যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহরাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব।'[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. সহিহ বুখারী : ৫০৮৯

উমরাহ বা হজপালনের নিয়াত করলে এই দুআ করতে হয়। ইহরামের শুরুতে যদি কেউ এই দুআ করে, তাহলে কোনো কারণে উমরাহ বা হজ শেষ করতে না পারলেও এ জন্য তাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না। কেউ এই দুআ না পড়লে তাকে মুহসার (محصر) বলা হয়। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে এসেছে—

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

'আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ-উমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানির জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তা-ই তোমাদের ওপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা কামাবে না, যতক্ষণ না কুরবানি যথাস্থানে পৌঁছে যায়।'[৪০]

মুহসার (محصر) বলা হয় তাকে, যে দুআতে এই শর্ত উল্লেখ করে না। এর অর্থ হলো সে মাথা কামিয়ে নেবে ও কুরবানি করে ফেলবে। হুদাইবিয়াতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করেছিলেন। অতিরিক্ত একটি বিষয় যোগ করছি। জীবনে একবার উমরাহ করা ওয়াজিব নাকি সুন্নাহ, এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।[৪১] যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে কি সেই বছরেই ওয়াজিব? এমন কোনো মূলনীতি কি আছে যে, সেই বছরেই উমরাহ করতে হবে? প্রায় বিশ বছর যে লোকগুলো তাওহিদের কালিমার বিরুদ্ধে মরণপ্রাণ যুদ্ধ করল, পরের বছর তাদেরই চারপাশে কাবার চতুর্দিকে উচ্চৈঃস্বরে তাওহিদের ঘোষণা দেওয়াটা এক চমকপ্রদ সাফল্যই বটে। তার ওপর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এটি করাও এক ধরনের বিজয় অর্জন।

---

৪০. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৯৬

৪১. ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহর মতে উমরাহ ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত ও মুস্তাহাব। (দেখুন : ইসলামকিউএ, ফাতওয়া নং : ৩৯৫২৪) –অনুবাদক

চুক্তির এ ধারাতে তাওহিদ বা দ্বীনের উসুলে কোনো আপস নেই। এটা ফিকহী বিষয়। আকিদা, তাওহিদ কিংবা উসুলুদ-দ্বীনের কোনো বিষয় নয়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সিদ্ধান্তগুলো আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত হয়েই নিয়েছিলেন।

অধ্যায় ছয়

অজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি

হুদাইবিয়ার সন্ধির ধারা অপব্যবহার করে যারা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করে, তাদের যুক্তির জবাবে কিছু নির্দিষ্ট খণ্ডন তুলে ধরা হয়েছে। ব্যাপক বা সাধারণ একটি জবাবের কথাও আমি বলেছিলাম। এটি আল-কিরমানী রহিমাহুল্লাহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'দ্বীনের মুস্তাহাবের মতো কিছু বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায়। যেমন, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'-এর পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ' লেখা—যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ইসলামের মূলনীতিতে প্রভাব না ফেলে।' এই হলো সারমর্ম। এখানে আসল কথা হচ্ছে—যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ইসলামের মূলনীতিতে প্রভাব না ফেলে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো— কুরাইশরা বলেছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও যারা কুরাইশদের থেকে মুমিনদের কাছে চলে যাবে, তাঁদেরকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে বা ফেরত পাঠাতে হবে। এ প্রসঙ্গে সুইহাইল ইবনু আমরের বক্তব্য ছিল এমন,

وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا

'এও লেখা হোক যে, আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার কাছে চলে আসে—সে যদিও আপনার দ্বীন গ্রহণ করে থাকে—তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।'[৪২]

অর্থাৎ, এ সন্ধির পর থেকে যে মক্কা ছেড়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মদিনায় হিজরত করবে, তাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا

'সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে?'[৪৩]

আরেক বর্ণনায় এসেছে—সুহাইল এও বলেছিল,

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا

'যারা আপনাদের কাছ থেকে (আমাদের কাছে) চলে আসবে, আমরা তাকে ফেরত পাঠাব না, কিন্তু আমাদের কেউ যদি আপনাদের কাছে চলে যায়, তবে আপনারা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবেন।'[৪৪]

সাহাবায়ে কেরাম বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَكْتُبُ هَذَا

৪২. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. সহিহ মুসলিম : ৪৫২৪

'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি এমনই লিখব?'[৪৫]

এটা লেখা উচিত কি না, সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

'হ্যাঁ। আমাদের কেউ যদি তাদের কাছে যায় তবে আল্লাহই তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের থেকে যে আমাদের কাছে আসবে আল্লাহ অচিরেই তার কোনো সুব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।'[৪৬]

চুক্তির আলাপ চলাকালীন সুহাইল ইবনু আমরেরই এক ছেলে আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে পালিয়ে শেকলপরিহিত অবস্থায় ধীরপায়ে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হন। তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন—এ কারণে তাঁর বাবার পক্ষ থেকেই তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তবুও তিনি মুসলিমদের কাছে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁর বাবা সুহাইলই যেহেতু চুক্তির দেনদরবার করছিল, তাই সে যখন দেখল তার ছেলে পালিয়ে এসে মুসলিমদের সাথে যোগ দিতে চাচ্ছে, তখন সে তার ছেলেকে ফেরত দিতে বলল। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রাখতে চাইলেও তাঁর বাবা সুহাইল কঠিনভাবে এটি প্রত্যাখ্যান করে। আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে মুসলিমদের বললেন,

---

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. প্রাগুক্ত

أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلاَ تَرَوْنَ

'হে মুসলিম-সমাজ, আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে! অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না আমি কতটা কষ্ট পাচ্ছি?'[৪৭]

আমরা অনেকবার বলেছি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র চেতনার ওপর গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দ্বীনের সিংহদের গড়ে তুলেছিলেন। দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলেছিলেন। কল্পনা করা যায় ব্যাপারটা তাঁদের কাছে কতটা আশ্চর্যের ছিল! তাঁদের কতটা ধাক্কা দিয়েছিল! এ কারণেই সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন এই ধারাটা চুক্তিতে লিখবেন কি না। তখন উমার রদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا

'আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?'[৪৮]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—অবশ্যই।

তিনি বললেন,

أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ

'আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের দুশমনরা কি বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়?'

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—অবশ্যই।

---

৪৭. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

৪৮. প্রাগুক্ত

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا

'তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হেয় হবো?'

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

'আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, তিনিই আমার সাহায্যকারী।'[৪৯]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক.

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্নের জবাবে বললেন,

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

'আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, তিনিই আমার সাহায্যকারী।'

তিনি বলেছেন—আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু আর দশজনের চেয়েও ভালো করে জানতেন, তিনি আল্লাহর রাসুল। 'আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল' বলা মানে হচ্ছে, বিষয়টা ওহী-সংক্রান্ত। ব্যাপারটা মাসলাহা (কল্যাণের উদ্দেশ্যে) বা অন্য কোনো কারণে হলে তিনি জবাবে বলতেন না যে—'আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল, আমি তাঁর

৪৯. প্রাগুক্ত

অবাধ্য হতে পারি না।' ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আদেশ না হলে, তিনি সাহাবিদের বলে দিতেন যে এটি মাসলাহা (অর্থাৎ, কল্যাণের উদ্দেশ্যে নেওয়া সিদ্ধান্ত)।

তিনি কেন বললেন না যে—উমার, মাসলাহার জন্য আমাদের এটা করতে হবে; আমরা দুর্বল, শত্রুরা খুবই শক্তিশালী; উমার, সাহাবিদের জড়ো করে মাশওয়ারা শুরু করো, চুক্তি ও আবু জান্দালের ব্যাপারে আলোচনা করো।

পরামর্শের জন্য অনেকবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সাহাবিদের ডেকে আলোচনা করেছেন। এখানেও তেমনটি করতে পারতেন—কিন্তু তিনি তা করেননি। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শরিয়াত-প্রণেতা। তার কথা, কাজ ও সম্মতি শরিয়াতের দলিল। তাই তিনি কেন এ সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটা জানলে আমরা শিক্ষা নিতে পারব এবং পরবর্তীকালে এর প্রয়োগও করতে পারব। তিনি উমার রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন—আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। অর্থাৎ, রাসুল হিসেবে এটাই আমার দায়িত্ব। তারপর তিনি বিষয়টা আরও পরিষ্কার করে দেন—আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না—এটা বলার মাধ্যমে, এ বাক্যটা এটা অপরিহার্য করে তোলে যে, ব্যাপারটা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেকই হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন, তার অর্থ হলো—এর বিপরীতে তিনি যদি কিছু করেন, সেটা আল্লাহর অবাধ্যতা হবে। অতএব, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত বলছেন যে— যুদ্ধ না করা, এই চুক্তি ও এ-জাতীয় ধারা মেনে নেওয়ার কারণ হলো, এটি আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ।

দুই.

সাহাবায়ে কেরাম সেই ধারা লিখবেন কি না জিজ্ঞেস করলে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন,

وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

'আর তাদের থেকে আমাদের কাছে যে আসবে, আল্লাহ অচিরেই তার কোনো সুব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।'[৫০]

আল্লাহ তাআলা আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁদের মতো সবার পরিত্রাণ ও মুক্তির পথ বের করে দেবেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা। ফলে আবু জান্দালসহ বাকিরা নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ তাঁদের প্রত্যেকের মুক্তির পথ বের করে দেবেন।

কিন্তু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মুসলিমদের গ্রহণ না করা বা কাফিরদের কাছে দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আজকের যুগে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, তারা নিরাপদ থাকবে। কারণ, মুসলিমদের গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করবে তারা তো আর ওহী পায় না বা গায়িবও জানে না। তারা কখনোই অনুমানে বলতে পারবে না যে, তারা যেসব মুসলিমকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, তারা নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনুল আরাবী[৫১] আল-মালিকীসহ অনেকের মত এই যে, 'কোনো মুসলিমকে গ্রহণ না করা কিংবা (কাফিরদের কাছে) সমর্পণ করার শর্তে চুক্তি করা অবৈধ।' রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ ধরনের পরিস্থিতিতে এসব চুক্তি করা যাবে না। কিছু উলামায়ে কেরাম হালকা

---

৫০. সহিহ মুসলিম : ৪৫২৪

৫১. তাঁর পুরো নাম আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবী। তিনি সুফী-দার্শনিক মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী নন। তিনি ছিলেন মালিকী ফিকহের একজন প্রসিদ্ধ আলিম এবং স্পেনের ইসলামী ইমারাতে তিনি বিচারক ও আঞ্চলিক আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ৫৪৩ হিজরি (১১৪৮ ঈসায়ী) সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ছিলেন একজন বিতর্কিত সুফী কবি ও দার্শনিক। তিনি মূলধারার কোনো আলিম বা ফকীহ ছিলেন না; বরং, বিভিন্ন বাতিল ও কুফরি আকিদার ব্যাপারে প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থানের কারণে মূলধারার উলামা বা ফকীহদের নিকট তিনি বিতর্কিত ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করেন ৬৩৮ হিজরি (১২৪০ ঈসায়ী) সালে। পাঠকরা যাতে দুজনকে গুলিয়ে না ফেলেন তাই এ দ্ব্যর্থতা নিরসন প্রয়োজন ছিল। —সম্পাদক

ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ইবনু হাযম সঠিক ও নির্ভুলভাবে এ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন—

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না। (তিনি যা বলেন,) এটা তো ওহী, যা (তাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রেরণ করা হয়।'[৫২]

ইমাম ইবনু হাযমের মতানুযায়ী—যারাই কুরাইশদের থেকে মুসলিমদের কাছে এসেছে, আল্লাহ তাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ দেবেন—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এটি যে ওহী, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে এমন ধারা লিপিবদ্ধ হওয়ার পরেও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিল তারা সব ধরনের অনিষ্টসহ কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে এ বিষয়টা নিয়ে যাচাই করবে, তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, এটা গায়িবের বিষয়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কেউ তা জানতে পারে না। অর্থাৎ, কী হবে তা কোনো খলিফা বা মুসলিম নেতা জানে না। কারণ হচ্ছে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসত। ফলে তিনি ওহীর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা দিতে পারতেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। অথচ, অন্য কেউ তো ভবিষ্যৎ বলতে পারে না, নিশ্চয়তাও দিতে পারে না যে, এ ধরনের মুসলিমরা নিরাপদ হয়ে যাবে এবং মুক্তির পথ পেয়ে যাবে। ওহী আসার কারণে একমাত্র রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তা বলতে পারতেন। তিনি যেগুলো বলেছিলেন 'হবে', সবগুলোই পরবর্তীকালে ঘটেছিল।

---

৫২. সূরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩-৪

ইমাম ইবনু হাযম বলেছেন এটা গায়িবের ব্যাপার। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কেউ আর তা জানতে পারে না। অতএব, কেউ এ ধরনের শর্ত বা ধারা দিতে পারে না। এ ধরনের শর্ত পূরণও করতে পারে না। ইবনু হাযমের কথা সংক্ষেপে মোটামুটি এমন যে, 'যদি আপনি গায়িব জানেন—জানেন যে কাফিরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন, নিরাপদ থাকবেন, মুক্তি পাবেন, আপনাকে কোনো ধরনের ক্ষতি স্পর্শ করবে না—তবে আগে বাড়ুন, এ ধরনের শর্ত দিন'।

যা হোক, এসব কখনোই আপনি জানতে পারবেন না। একমাত্র রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ওহীর মাধ্যমে তা জানতে পারতেন। অতএব, তাঁর পর আর কারও জন্যই এ ধরনের শর্তে রাজি হওয়া কিংবা এমন শর্তবিশিষ্ট ধারা অনুমোদন দেওয়া বৈধ নয়। এটা কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এই ওয়াদা ও গায়িব মুজিযা ছিল, যা আল্লাহই কার্যকর করেন। এজন্যই দেখা গেছে, পরবর্তীতে যে-ই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে গেছে, সে পালাতে পেরেছে এবং নিরাপদ থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই একত্র হয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। মদিনা থেকে কিছুটা দূরে তাঁরা একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে থেকে তাঁরা কুরাইশদের বিভিন্ন কাফেলায় হামলা করতেন। এভাবে এক পর্যায়ে তাঁরা কুরাইশদেরকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেন। অতঃপর কুরাইশরা বাধ্য হয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের মদিনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে এবং এ শর্ত উঠিয়ে নিতে বলে।

'ফাতহুল বারী'[৫৩] ও *'তুহফাতুল আহওয়াযী'*তে[৫৪] এসেছে, এ বিষয়ে

---

৫৩. 'সহিহুল বুখারী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর অন্যতম। ৩০ বছর সময় নিয়ে এটি রচনা করেছেন হিজরি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ। (মৃত্যু: ৭৭৩ হি.) —সম্পাদক

৫৪. 'সুনানুত তিরমিযী'র বিশ্বনন্দিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি রচনা করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ আবদুর রহমান মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৩৫৪ হি.) —সম্পাদক

ইবনুল আরাবী আল-মালিকীর মত ইবনু হাযমের মতোই। যার সারকথা মোটামুটি এমন—'মুসলিমদের কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মর্মে যে চুক্তি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন, এ ধরনের চুক্তি করা তাঁর পরে আর কারও জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাঁর রাসুলের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, আল্লাহ এর হিকমাহ, মাসলাহা ও উপকার সম্পর্কে অবগত যে, তা ইসলামের জন্য স্পষ্টত বিশাল প্রভাব বয়ে আনবে।'[৫৫]

অবশেষে গায়িবের হাকিকত সত্যে পরিণত হয়। কাফিররা চুক্তির ধারা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানাতে প্রতিনিধি পাঠায়।

তিন.

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

> 'আল্লাহ অচিরেই তার কোনো ব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।'[৫৬]

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে 'ইন-শা-আল্লাহ' বলা শিখিয়েছিলেন। কুরআনুল কারিমের এসেছে—

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

---

৫৫. অর্থাৎ, এটা যেহেতু গায়িবের জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়—আর সকল গায়িবের জ্ঞান যেহেতু আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত—তাই আল্লাহ এ ব্যাপারে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করেই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তা বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কারও ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। —সম্পাদক

৫৬. সহিহ মুসলিম : ৪৫২৪

''আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ছাড়া আপনি কোনো কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব।'[৫৭]

ভবিষ্যতে হতে পারে, এমন প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইন-শা-আল্লাহ' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনিও আমাদের ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সকল ব্যাপারে 'ইন-শা-আল্লাহ' বলা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অথচ, হুদাইবিয়ার এ ব্যাপারটিও ভবিষ্যতের বিষয়। এখানে তিনি 'ইন-শা-আল্লাহ' বলেননি। শুধু বলেছেন—

سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

'আল্লাহ অচিরেই তার কোনো ব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।'[৫৮]

আসলে এটি ছিল গায়িবের বিষয়। ভবিষ্যতের ব্যাপার। তবে এটি ছিল আল্লাহর ওয়াদা। তিনি 'ইন-শা-আল্লাহ' না বলার কারণ হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এমনটি নিশ্চয়ই ঘটবে।

চার.

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

'আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো

---

৫৭. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ২৩-২৪

৫৮. সহিহ মুসলিম : ৪৫২৪

তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে। অতঃপর আল্লাহ জানেন, যা তোমরা জানো না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদের এক আসন্ন বিজয়।'[৫৯]

আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ যা জানেন তা তোমরা জানো না। তিনি এক আসন্ন বিজয় দিয়েছেন। তিনি এই ঘটনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে নির্দেশনা ও আদেশ দিচ্ছিলেন। এটি ইবনু হাযম ও ইবনুল আরাবীসহ যাঁরা এ মত পোষণ করেন, তাঁদের মতকেই সমর্থন করে।

পাঁচ.

মক্কায় পৌঁছার আগে 'আস-সানিয়াহ' নামক স্থানে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী কাসওয়া বসে পড়ে। সবাই একে উঠানোর সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ। তাঁরা বলতে শুরু করেন,

خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ

'কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'[৬০]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ

'কাসওয়া ক্লান্ত হয়নি আর এটা তার স্বভাবও নয়; বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি (আবরাহার) হস্তীবাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।'

এখানে এ প্রসঙ্গ আনা হয়েছে—কীভাবে আল্লাহ তাআলা বাদশাহ

---

৫৯. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৭

৬০. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

আবরাহা ও তার হাতিগুলোকে থামিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা আর মক্কার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। এ ঘটনা ছিল আল্লাহর এক অলৌকিক নির্দেশনা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী কাসওয়া থেমে যাওয়ার ঘটনাটিও ঠিক এমনই। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলছেন কাসওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত। ঠিক একইভাবে এই চুক্তি ও এর ধারাগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত।

ছয়.

কাসওয়া থামার পর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, সে ক্লান্ত হয়নি। তিনি বলেছিলেন,

> وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا
>
> 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—কুরাইশরা আল্লাহর যেকোনো বিষয়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।'[৬১]

ইমাম বদরুদ্দীন আইনীও তাঁর *'উমদাতুল কারী'*তে[৬২] উল্লেখ করেছেন, মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়া মর্মের ধারাটি কেবল রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট। যা হোক, তিনি এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস,

---

৬১. প্রাগুক্ত

৬২. এটিও সহিহ বুখারীর আরেকটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এর রচয়িতা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহিমাহুল্লাহ। তিনি ইন্তিকাল করেন ৮৫৫ হিজরিতে। —সম্পাদক

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا

'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—কুরাইশরা আল্লাহর যেকোনো বিষয়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।'

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই কুরাইশদের যুক্তিসঙ্গত শর্ত গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন। আরেক কারণ হলো—যেহেতু তাওহিদবাদী বন্দিরা ফিরে গিয়ে কাবা তাওয়াফ করবে, সলাত আদায় করবে, আল্লাহর ঘরকে তাযিম করবে—এতে আল্লাহর নিদর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানকে সম্মান করার শর্ত পূরণ হবে। এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, এটা মক্কা ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব। আর কারও জন্য নয়।

সাত.

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের বেশ কয়েকবছর পরের ঘটনা। কাদিসিয়াহ যুদ্ধের[৬৩] আগে একদল পারসিয়ান রাতে নিজেদের শিবির থেকে পালিয়ে মুসলিমদের শিবিরে এসে আত্মসমর্পণ করে। দিনের আলো ফুটলে পারসিয়ান সেনাপ্রধান রুস্তম এটা জানতে পেরে, মুসলিম বাহিনীর প্রধান সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দূত পাঠায়। সে পালিয়ে আসা সেনাদের ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু ফিরিয়ে

৬৩. কুফা নগরীর দক্ষিণে ফোরাত নদীর পুর্ব দিকের মরুভূমিতে একটি স্থানের নাম কাদিসিয়াহ। এ স্থানে ১৫ হিজরিতে মুসলিমদের সাথে পারসিকদের একটি বড়ো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম সেনানায়ক ছিলেন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লহু আনহু। পারসকিদের সেনা ছিল দুই লাখেরও বেশি। অপরদিকে মুসলিমদের ছিল মাত্র ছত্রিশ হাজার। ঐতিহাসিক এ যুদ্ধে আল্লাহর হুকুমে মুসলিমরা বিজয় লাভ করে। (দেখুন : মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারি ২০১৫)—অনুবাদক

দেওয়ার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কথার সারাংশ ছিল এমন—'যারা পালিয়ে এসেছে, তারা আমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তাদের প্রতিরক্ষা করা, আগলিয়ে রাখা আমাদের ওপর ফরজ। সেই সাথে এও নিশ্চিত করা যে, তাদের একজনের ওপরও যেন সীমালঙ্ঘন না করা হয়।' দূত ফিরে গিয়ে রুস্তমকে জানায় যে, পালিয়ে যাওয়াদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব মুসলিমরা প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে রুস্তম রেগে যায় এবং তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে বলে।

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়াটা অবৈধ হবার ব্যাপারে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলেন। তৎকালীন খলিফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহুই তাঁকে সেনাপ্রধান করে পাঠিয়েছিলেন। আর এটা সম্ভব নয় যে, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। কারণ উমার রদিয়াল্লাহু আনহু নিজ সেনাদের প্রতি এতই সচেতন থাকতেন যে, তাঁর এ ব্যাপারে বলা হয়—'তিনি সেই বাবার মতো যে তার সন্তান হওয়ার অপেক্ষায় থাকে'। সুতরাং, তিনি তো এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে সাহাবাবেষ্টিত থাকতেন, সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহুও তেমনই। আর এমন কোনো সাহাবির কথা জানা যায় না, যিনি সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহুর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ, এটা সম্ভাব্য ইজমার প্রামাণ্য ইঙ্গিত।

আট.

বন্দিদের মুক্ত করা কতটা দরকার এবং সালাফরা বিষয়টাকে কত গুরুত্বের সাথে নিতেন, আমি আগেও বলেছি। এ নির্দেশনাটা আমাদের সালাফে সালেহিন ও ন্যায়পরায় খলিফাগণ খুবই গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করতেন। এর কারণ হিসেবে এই হাদিসই যথেষ্ট—

فُكُّوا الْعَانِيَ

'বন্দিদের মুক্ত করো।'[৬৪]

এটা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ। মুসলিমদের ওপর ফরজ। যেখানে বন্দিদের মুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে কাউকে শত্রুর কাছে তুলে দেওয়ার বৈধতা থাকা কীভাবে সম্ভব?

ইমাম মারদাওয়ী *'আল-হাওয়িল কাবির'* গ্রন্থে বলেন, কোনো মুসলিম এলাকার আমির (গভর্নর বা প্রশাসক কোনো) মুসলিমকে গ্রেফতার করতে কাফিরদের সহায়তা করতে পারেন না। *'শারহু মুখতাসারি খলিল'* গ্রন্থের লেখক বলেন, মুসলিমদের সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলেও বন্দিমুক্ত করা (ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ) একটি নির্দেশ। দারুল হারব[৬৫] থেকে হিজরতের বিষয়টি একই—শাহাদাহ (পাঠের মাধ্যমে ইসলাম) গ্রহণ করার পর দারুল হারব থেকে হিজরত করা আবশ্যক। ইবনু রুশদ এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা আছে মর্মে বর্ণনা করেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে দারুল হারব থেকে হিজরত করা আবশ্যক। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যেখানে সালাফদের মৌখিকভাবে গাল দেওয়া হয়, সেখানে বসবাস করা মাকরুহ'। সুতরাং, এমন এক ভূমির কথা চিন্তা করুন, যা আল্লাহর অবমাননা অর্থাৎ শির্কের বিচরণে সয়লাব। এই শির্ক

---

৬৪. সহিহ বুখারী : ৫১৭৪

৬৫. কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধান ও আইনকানুনের প্রাধান্য থাকলে সে ভূমিকে দারুল কুফর বা দারুল হারব বলা হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও সেটা দারুল কুফরই থাকবে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قَالَ الْجُمْهُورُ: دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي تَزَلُهَا الْمُسْلِمُونَ، وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَمَا لَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَاصَقَهَا، فَهَذِهِ الطَّائِفُ قَرِيبَةٌ إِلَى مَكَّةَ جِدًّا وَلَمْ تَصِرْ دَارَ إِسْلَامٍ بِفَتْحِ مَكَّةَ.

'অধিকাংশ ফুকাহা বলেন, "দারুল ইসলাম' ওই ভূখণ্ডকে বলে, যেখানে মুসলিমদের আগমন ঘটে এবং তাতে ইসলামী বিধিবিধান চালু থাকে। আর যেখানে ইসলামী বিধিবিধান চালু থাকবে না, সেটা 'দারুল ইসলাম' হবে না; যদিও তা দারুল ইসলামের সাথে লাগোয়া অঞ্চল হোক। দেখো এই যে মক্কার অদূরেই অবস্থিত তায়িফ, মক্কা বিজয় সত্ত্বেও সেটা 'দারুল ইসলাম' হয়ে যায়নি।' (আহকামু আহলিয যিম্মাহ : ২/৭২৮)। (দেখুন : হাযিহি আকিদাতুনা) –অনুবাদক

তখন মক্কায় উন্মুক্ত ও ব্যাপক ছিল। কোনো মুসলিমকে সে স্থানে কীভাবে ফেরত পাঠানো যেতে পারে, যেখান থেকে হিজরত করাই ফরজ?

এখন ব্যাখ্যা করা হবে, কীভাবে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ধারাযুক্ত চুক্তিতে একমত হলেন। ইবনুল আরাবী, ইবনু হাযম-সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকেই ব্যাখ্যা করা হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ মতের সমর্থনে আমার পেশকৃত দলিলসমূহ।

কুরাইশদের কাছে মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বিবেচনায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবহারই সংগত। ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার করাটা ভুল। এর যৌক্তিক কারণ সামনে দেখানো হবে।

মনে করুন, কোনো বাচ্চা রাস্তায় দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার বাবা-মা ভালো—তাহলে কি বলা যাবে, 'আমার ভয় হয়, বড়ো হয়ে সে তার বাবা-মাকে নির্যাতন করবে, তাদের কাফির বানিয়ে দেবে। তাই, আমি খিযির আলাইহিস-সালামের মতোই এ বাচ্চাকে মেরে ফেলব?'

খিযির আলাইহিস-সালামের সেই ঘটনা প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

'এরপর তারা (খিযির ও মূসা আলাইহিমুস-সালাম) চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন (খিযির) একটি বালকের সাক্ষাৎ পেল, তখন সে তাকে হত্যা করে ফেলল। (মূসা) বলল, "আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন,

কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'[৬৬]

এ হত্যার কারণস্বরূপ একই সূরায় আরও বর্ণিত হয়েছে—

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

'বালকটির ব্যাপার হলো, তার বাবা-মা ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে।'[৬৭]

তাহলে এখন কি এ যুক্তি দিয়ে কেউ চাইলে রাস্তায় দুষ্টুমি করতে থাকা কোনো বাচ্চাকে হত্যা করতে পারবে?

না, এমনটা করা যাবে না। বিষয়টা আসলে গায়িবের সাথে সম্পৃক্ত। এটা ওই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্যই খাস ছিল। আজকের যুগে এ ধরনের কিছু করা যাবে না। এ ধরনের কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। এই আয়াতের ভিত্তিতে কোনোভাবেই কোনো বাচ্চাকে হত্যা করা যাবে না। হুদাইবিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মুসলিমদের ফেরত পাঠানো করা যাবে না, মুসলিমদের সমর্পণে রাজি হওয়া যাবে না। দাবি করা যাবে না যে, মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়াটা রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দ্বীনের সাথে আপসের দলিল। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো নির্দেশনা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ চেয়েছেন বলেই তিনি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই কাজ করছিলেন।

৬৬. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৭৪
৬৭. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮০

অধ্যায় সাত

যে পাঠ উপেক্ষিত

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দেওয়াটা বিশেষ ব্যতিক্রমী বিষয়, যা ওই নির্দিষ্ট পরিস্থিতে শুধু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের জন্যই খাস ছিল। আমরা এই মতই গ্রহণ করেছি। এর বাইরেও আরেকটি মত রয়েছে। অনেক আলিমের মত সেটি। তাঁদের মতে কাফিরদের কাছে মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়া মর্মে চুক্তির বিষয়টা এই আয়াত নাজিলের পর রহিত হয়ে গেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

‘হে ঈমানদারগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানো যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদের কাফিরদের কাছে

ফেরত পাঠিয়ো না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররাও এদের জন্য হালাল নয়।'[৬৮]

'তাদের ফেরত পাঠিয়ো না' মানে হলো, মুসলিম নারীদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাফিরদের কাছে মুসলিম নারীদের ফেরত পাঠানো বৈধ নয়। এর কারণ হচ্ছে তাদের হয়তো কাফিরদের সাথে বিয়েতে বাধ্য করা হবে অথবা তারা কাফির স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, যার ফলে সে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, এর কারণ নারীরা একটু বেশিই আবেগী। ফলে ইসলাম-ত্যাগে প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে অথাবা (ইসলাম-ত্যাগের জন্য) তাদের ওপর চাপপ্রয়োগ করা হবে। আর যেহেতু তারা শারীরিকভাবে দুর্বল, তাই না চলে আসতে পারবে আর না পালাতে পারবে।

কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়ার ওই ধারা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা বর্ণনাটা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট মনে করেন। তবে আরেকটি বর্ণনা ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত দেয়। তাই, কিছু আলিমের মতে মহিলারা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অন্যরা বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে পুরুষদের মতো নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এই আয়াত এটাও রহিত করে দেয় বা নির্দিষ্ট করে দেয়। এটাও হতে পারে যে, নারীদের বিষয়টা হুদাইবিয়ার সেই ধারাতে স্পষ্ট ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়াতে এর বিধান পরিষ্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

'তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না।'[৬৯]

---

৬৮. সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ১০

৬৯. সূরা আল-মুমতাহানা, ৬০ : ১০

উভয়ক্ষেত্রেই হুদাইবিয়ার বাইরেও এটা নারীদের ব্যাপারে সম্ভাব্য প্রযোজ্য। সবার মতে কোনো প্রেক্ষাপটেই কাফিরদের কাছে নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

ইমাম শাফিয়ী, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনুল আরাবী-সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেন—'কাফিরদের কাছে নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, সমর্পণ করা যাবে না'। এটা তো প্রশ্নেরই ঊর্ধ্বে। মুসলিম বিশ্বের খলিফা কিংবা প্রাদেশিক কোনো আমির বা নেতা এ ধরনের চুক্তিতে সম্মত হতে পারেন না, এসব চুক্তি পূরণও করতে পারেন না।

মুসলিম নামধারী এক পথভ্রষ্ট, ঘৃণ্য ও মর্যাদাহীন তাগুতকে আপসকামীরা খলিফা হিসেবে নিয়েছিল। সে জায়োনিস্টদের কাছে এক সম্মানিতা পর্দানশিন বোনকে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই তাওহীদবাদী নারী, যে কি না 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, তাকে শুধু সীমান্ত থেকে বহিষ্কারই করা হয়নি, বরং বন্দি করা হয়েছে, শেকলবদ্ধ করা হয়েছে। তারপর জায়োনিস্টদের কাছে উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জায়োনিস্ট কোর্টেই বিচার বসবে, জায়োনিস্ট বিচারক বিচার করবে। জায়োনিস্ট কারাগারেই তাঁকে রাখা হবে—এসব জেনেও তারা এই ঘৃণ্য কাজ করেছে। এ হলো আজকের তথাকথিত খলিফার অবস্থা।

তাদের তাওহিদ হালকা হয়ে গেছে—শুধু তাওহিদই হালকা হয়নি, তাদের মর্যাদা ও পুরুষত্বও হালকা হয়ে গেছে। আপনি তার সাথে কী নিয়ে ইখতিলাফ করছেন সেটা বিষয় নয়, তার ব্যাপারে কী অভিযোগ, তাও দেখার বিষয় না—যে এ ধরনের কিছু মেনে নিয়েছে তার কোনো আত্মমর্যাদাই নেই। সে একটা দাইয়ুস।[১০] সবচেয়ে দুর্বল মতানুসারেও,

---

১০. রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ

'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না—পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান; পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা এবং দাইয়ুস

যদি জানা যায় কাফিররা তাকে ফিতনায় ফেলবে, এমতাবস্থায় কোনো পুরুষকেও ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। তাহলে দুর্বল ও অরক্ষিত নারীর হুকুম চিন্তা করুন! এ তো প্রশ্নেরই ঊর্ধ্বে। একজন মুসলিম নারীকে কোনোভাবেই কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

প্রয়োগশূন্য কুরআন তিলাওয়াত অতিসরল লোকদের বোকা বানাতে পারে, তাওহিদবাদীদের নয়। মাইমুন বিন মিহরান রহিমাহুল্লাহ বলেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيَ وَيَلْعَنُ نَفْسَهُ فِي قِرَاءَتِهِ فَيَقُولُ: أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَإِنَّهُ لَظَالِمٌ

> 'অনেকে সলাত আদায় করে ঠিকই, কিন্তু কুরআন তিলওয়াত করতে গিয়ে নিজেকে অভিশাপ দেয়। যেমন সে পাঠ করে, "সাবধান! আল্লাহর অভিশাপ জালিমদের ওপর।' অথচ সে নিজেই জালিম।'[৭১]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মারাত্মক ভুল করেছিল। কিন্তু তবুও অনেক উলামায়ে কেরাম নারীর সম্মান ও তাঁদের প্রতি দ্বীনি গাইরত অনুভব করার জন্য তার প্রশংসা করেছেন।

এ ছাড়াও আরও গুরুতর বিষয় রয়েছে। যেমন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব, আল্লাহর শরিয়াহ পরিবর্তন ইত্যাদি। চীন সরকারের কাছে মুসলিমদের সমর্পণ করে দেওয়াও একই ধরনের ব্যাপার। ড. আফিয়া সিদ্দিকিকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়াটাও এর ব্যতিক্রম নয়।[৭২]

পুরুষ (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে, বাধা দেয় না)। (মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ৬১৮০; সহিহুল জামি, হাদিস নং : ৩০৭১) –অনুবাদক

তবে, শাইখ এখানে এই অর্থে 'দাইয়ুস' বলেছেন যে, মুসলিম হিসেবে যে ধরনের গাইরত বা আত্মমর্যাদাবোধ থাকা উচিত এ ধরনের লোকদের মাঝে তা নেই। –সম্পাদক

৭১. তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮২, বর্ণনা নং : ৮৪৮৪

৭২. পাকিস্তানি স্নায়ু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকি। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। যুক্তরাষ্ট্রের

এবার আমরা আমাদের মূল বিষয়ে আসি। মূল বিষয় হচ্ছে নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া বা সমর্পণ করা যাবে না। কিছু উলামা যেমন *'আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ'*-গ্রন্থে আবু জাফার আন-নাহহাস, *'হাশিয়াতুদ দুসুকি'* ও *'ফাতহুল কাদির'*-এর লেখকসহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম হয় নিজে বর্ণনা করেছেন অথবা এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কোনো মুসলিম পুরুষ বা নারীকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চুক্তি মুসলিম বিশ্বের খলিফা কিংবা প্রাদেশিক কোনো আমির বা নেতা পূর্ণ করতে পারবেন না। কারণ, উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে হুদাইবিয়ার ওই চুক্তিধারা রহিত হয়ে গেছে। তাঁরা বলেছেন এটি বিশেষভাবে নারীদের উদ্দেশ্য করলেও পুরুষরাও এর অন্তর্ভুক্ত। পুরুষরা অন্তর্ভুক্ত হবার কারণ হলো, মাফসাদা (অনিষ্ট বা ক্ষতি)। এ পরিস্থিতিতে পুরুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাফসাদা নারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতোই।

আবু জাফার আন-নাহহাস বলেন, কোনো মুসলিমকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে চুক্তি করা কোনো মুসলিম নেতার জন্য বৈধ নয়। কারণ, উলামায়ে কেরামের মতে শির্কের ভূমিতে বসবাস করাই বৈধ নয়, সুতরাং কীভাবে শির্কের ভূমিতে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং কোনো নারীকে ফিরিয়ে না দেওয়া-সংবলিত আয়াত নাজিলের পরে আরও আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

Massachusetts Institute of Technology (MIT) থেকে নিউরোসায়েন্সে স্নাতক এবং *Brandeis University* থেকে পুনরায় স্নাতকসহ নিউরোসায়েন্সে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি দাওয়াতি কাজসহ ত্রাণকার্যে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ২০০২ সালে তিনি ও তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ২০০৩ সালে তিন সন্তানসহ তাঁকে অপহরণ করে এফবিআই-এর হাতে তুলে দেয়। এরপর আফগানিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়, ধর্ষণ করা হয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এসব চলতে থাকে। পরে তাঁকে আফগানিস্তানে গ্রেফতার দেখানো হয়। এরপর আরেক নাটক মঞ্চায়ন করা হয় সেখানে—সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত তাঁকে ৮৬ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এখনো তিনি কারাগারেই রয়েছেন। –অনুবাদক

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

'সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। এরপর তোমরা এ ভূমিতে চার মাস সময় পরিভ্রমণ করো।'[৭৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের কাছে কীভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে (হুদাইবিয়াতে) তোমরা পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।[৭৪]

উলামায়ে কেরাম বলেন, এই আয়াতগুলো মাসজিদুল হারামের কাছে ছাড়া মুশরিকদের সাথে যেকোনো ধরনের চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। এরপর আরও বহু আয়াত রয়েছে, যা এই বিষয়কে আরও স্পষ্ট করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

---

৭৩. সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১-২

৭৪. সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৭

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

'এরপর নিষিদ্ধ মাস পার হয়ে গেলে মুশরিকদের (সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে) হত্যা করো, যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দি করো, অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবাহ করে, সলাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।'[৭৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'তোমরা যুদ্ধ করো আহলুল কিতাবের ওই লোকদের সাথে— যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম (হিসেবে মান্য) করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীন—যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে (ততক্ষণ এ যুদ্ধ চালিয়ে যাও)।'[৭৬]

ইমাম ইবনু হাযমসহ আরও অনেক আলিমই বলেন, এই আয়াত সবধরনের চুক্তি ও ধারাকে বাতিল করে দেয়। এসব আয়াত নাজিলের পর কেবল একধরনের সম্পর্ক ও চুক্তিই হতে পারে। আর তা হলো—হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়তো তাদের থেকে জিযিয়া নেওয়া হবে—তাও না হলে তাদের যুদ্ধ করা হবে।

যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির হাদিসকে দ্বীনের মূলনীতিতে আপসের জন্য

৭৫. সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৫

৭৬. সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ২৯

অপব্যাখ্যা করে, এখন আমাদের আলোচনা তাদের খণ্ডনের জন্য একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তারা একে নিজেদের মাসলাহা (কল্যাণ) দাবির সমর্থনে ব্যবহার করে। ভোট-পদ্ধিত, গণতন্ত্র, ইন্টারফেইথ, কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও বশ্যতা, আল্লাহর শরিয়াহ পরিবর্তন, শরিয়াহ বাস্তবায়নে বিলম্ব করা, মুসলিমদের জন্য অবমাননা হয় এমন চুক্তি করা—প্রভৃতি অপকর্মে ব্যবহার করে। তাদের যখনই দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করার প্রয়োজন হয়, তখনই তারা এই কাহিনিকে কাজে লাগায়।

আমরা আসলে হুদাইবিয়ার সন্ধির ধারাগুলো থেকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে তুলনামূলক বেশি আলোচনা করছি। অর্থাৎ, কাফিরদের কাছে মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে। কারণ, এটা সেই অন্যতম ধারা যা তারা প্রায়ই ব্যবহার করে। কিন্তু এটাই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আমি সর্বোপরি এ বিষয়ে দুটো মত তুলে ধরলাম।

এক. ওই সময়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সেটি খাস বিধান ছিল। তিনি ছাড়া আর কেউ এটা করতে পারবে না। উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন উপায়ে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাদিসের যে শর্ত উল্লেখ ও পর্যালোচনা করেছি, তা এ বিষয়কেই সমর্থন করে।

দুই. দ্বিতীয় মত হলো এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থনে বহু আলিম বিভিন্ন উপায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

এখন আমি নিরপেক্ষ হয়ে তৃতীয় আরেকটি মত উল্লেখ করতে চাই। আমি দেখাতে চাই তারা কী ধরনের কারসাজি করে থাকে। তারা তো এই দুর্বল ও ভুল মতটার প্রয়োগও সঠিকভাবে করতে পারে না। আমি দেখাতে চাই, এর ব্যবহারে তারা কী ধরনের জালিয়াতি করে এবং কীভাবে তাদের দ্বারা এর অপব্যবহার হয়।

ফিকহের ক্ষেত্রে দেখা যায় উলামায়ে কেরাম সবসময় ইখতিলাফ করেন। কোনো মত স্পষ্ট হলে এবং ওই মতের পক্ষে প্রমাণ থাকলেও ইখতিলাফ

CamScanner

ব্যাপারটা থাকেই। আমরা একমত যে, দলিলই হলো কোনো কিছু নির্ধারণের মূল প্রতিপাদ্য। কোনো বিষয়ে একাধিক মত থাকার মানে এই নয় যে, ইচ্ছা করলেই সেখান থেকে সুবিধামতো একটা মত বেছে নেওয়া যাবে। সকল উলামায়ে কেরাম কোনো ফিকহী মাসআলায় একমত হয়েছেন, এমন ব্যাপার খুঁজে পাওয়াটা আসলে বিরল। ইবনু হাযম, ইবনু আবদিল বার-সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেন, এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে—প্রবৃত্তি, সুবিধা কিংবা অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য কোনো মত বেছে নেওয়া আল্লাহর দ্বীনের সাথে খেলতামাশার নামান্তর। অবশেষে তার মাঝে মন্দ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না, আর সে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হবে।[৭৭]

---

৭৭. ইমাম মা'মার ইবনু রশিদ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৫৩ হিজরি) বলেছেন,

لو أن رَجُلًا أَخذ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْمَانِ النِّسَاء فِي أَدْبَارِهِنَّ. ويقول أهل مكة في المتعةِ وَالصَّرْفِ، وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي المسكر كانَ شَر عِبَادِ اللهِ.

'কেউ যদি গান শোনা ও স্ত্রীর পায়ুপথে সংগমের ক্ষেত্রে কিছু মদীনাবাসী মুজতাহিদের ফাতওয়া অনুসরণ করে এবং মুতাহ বিয়ে ও বাই সারফ-এর ক্ষেত্রে কিছু মক্কাবাসী মুজতাহিদের ফাতওয়া অনুসরণ করে, আর মাদকদ্রব্য সেবনের ক্ষেত্রে কিছু কুফাবাসী মুজতাহিদের ফাতওয়া অনুসরণ করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দায় পরিণত হবে।' (ইবনু হাজার, আত-তালখিসুল হাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, 'ইকদুল জিদ, পৃষ্ঠা : ২৫)

ইমাম কাযী ইসমাইল ইবনু ইসহাক রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৮২ হিজরি) বলেন,

وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلاَّ وَلَهُ زَلَّة، وَمن أَخَذَ بِكُلِّ زَلَل العُلَمَاء ذهبَ دِينُه

'প্রত্যেক আলিমেরই কিছু-না-কিছু পদস্খলন (বা ইজতিহাদি ভুল) রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি আলিমদের পদস্খলনগুলো সংগ্রহ করে আমল করতে থাকে, তার দ্বীনই নষ্ট হয়ে গেল।' (ইমাম আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৫)।

ইমাম সুলাঈমান আত-তাইমি (মৃত্যু : ১৪৩ হিজরি) বলেন, 'যদি তুমি সকল আলিমের ছাড়গুলো গ্রহণ করো, তাহলে তোমার মধ্যে সকল নিকৃষ্ট কাজের সমাবেশ ঘটবে।' (ইমাম ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২৭)

ইমাম ইবরাহীম ইবনু আবি উলাইয়া (মৃত্যু : ১৫২ হিজরি) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুধুই ইলমের ব্যতিক্রমধর্মীর অনুসরণ করবে সে বিপথগামী।' (ইমাম আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২৫; শাওকানি, ইরশাদুল ফুহুল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫৩)।

ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু : ১৫৭ হিজরি) বলেন, 'যে ব্যক্তি আলিমদের নাওয়াদির (বিরল মতামত) অনুসরণ করবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।' (আত-তুয়াইজিরি, তাতাব্বুউর রুখাস বাইনাশ-শারয়ী ওয়াল ওয়াকিয়ি, পৃষ্ঠা : ৩২) –অনুবাদক

যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং তাগুতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ—এমন আলিমরা প্রবৃত্তির অনুকূলে অথবা তাগুতকে সন্তুষ্ট করতে মনমতো ফাতওয়া বাছাই করে। দলিলসমর্থিত ফাতওয়া তারা গ্রহণ করে না। অনেক আলিমের মতে, বিভিন্ন মত থেকে বেছে বেছে প্রবৃত্তির অনুকূলে কিছু নেওয়াটা যিনদিকদের কাজ। আবার কেউ কেউ একে কেবল ফাসিকি কাজ বলেছেন। সবচেয়ে বোকা সে, যে দুনিয়ার বিনিময়ে তার দ্বীনকে নিলামে বিক্রি করে। ক্ষণিকের দুনিয়ার জন্য সে তার দ্বীনকে হারায়, চিরস্থায়ী আখিরাতকে হারায়। কিন্তু এর বিনিময়ে একটা কিছু তো পায়। হ্যাঁ, দুনিয়াই পায়। কিন্তু দুনিয়া যে ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা তো অবধারিত। যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন সে নিদারুণ অনুতপ্ত হবে। সুতরাং কতটা মূর্খ ওই ব্যক্তি, যে তাগুতের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে নিজের দ্বীনকেই বিক্রি করে দেয়। সেসব অলস আলিমগোষ্ঠীই এটা করতে পছন্দ করে, যারা তাগুতের প্রাসাদে নিজের অবস্থান তৈরি করতে চায়।

এসব প্রাসাদপন্থী আলিম দেড় মিনিটের ভিডিও-ক্লিপে এসে অবাধে বলবে, অন্য দেশে মুসলিমদের সমর্পণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তারপর তাগুতের অপকর্ম বৈধ করতে আবু জান্দাল ও আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহুমের কথা আনবে। যতটা সহজে তারা এসব যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। তারা কাফিরদের কাছে মুসলিমদের অর্পণ করাটা বৈধ প্রমাণ করতেই এটা ব্যবহার করছে। এই মুসলিমদের তো কাফিররা বিচার করবে। তারা দ্বীন নিয়ে ফিতনায় পড়বে। তাদের নির্যাতন করা হবে।

এসব আলিমরা একটুও চিন্তা করে না যে, এ ধরনের কথা বা ফাতওয়ার জন্য তারা আল্লাহর ক্রোধ ও রোষানলে পড়তে পারে। ইমাম ইবনু আবদিল-বার রহিমাহুল্লাহ তাঁর *'আত-তামহিদ'* গ্রন্থে এটা ব্যাখ্যা করেছেন।

তাগুতদের সেসব কথাবার্তা বা ফাতওয়াই দরকার যা, চীন সরকারের

কাছে মুসলিমদের ফিরিয়ে দেওয়াকে সমর্থন করে। ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপক্ষের মতটা দুর্বল ও ভুল হলেও সেটা এমন শিথিল নয়, যেভাবে তারা চিত্রিত করে। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করে আবারও বলছি, এই মত দুর্বল ও ভুল। উম্মাহকে গোমরাহ করার আগে ফুকাহায়ে কেরামের বইগুলো খুলে দেখুন। মতটা ভুল ও দুর্বল হলেও তাতে অনেক শর্ত ও ব্যাখ্যা রয়েছে। একটা নমুনা দিচ্ছি।

উলামায়ে কেরাম রদ (الرد) ও তাসলিম (التسليم)-এর মাঝে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। রদ হচ্ছে অস্বীকৃতি জানানো, প্রত্যাখ্যান করা অথবা ফিরিয়ে দেওয়া। আর তাসলিম হলো সমর্পণ করা বা নিজ থেকে দিয়ে দেওয়া। ভিন্ন দুইটি বিষয়। *'আসনাল মাতালিব'*-এর লেখক বলেন, 'রদ হলো তাদের ফেরত পাঠানো, প্রত্যাখ্যান করা। এটা তাসলিম থেকে ভিন্ন। তাসলিম হলো কাফিরদের কাছে তাদের সমর্পণ করে দেওয়া'। ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ *'কিতাবুল উম্ম'*-এ[৭৮] হুদাইবিয়ার আলোচ্য প্রেক্ষাপট নিয়ে যা বলেছেন, তা অনেকটা এমন— হুদাইবিয়াতে সাহাবি আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছে সেটা ছিল রদ। অর্থাৎ, অন্যান্য মুসলিমদের মতো তাঁকে সাথে রাখা হচ্ছে না, বরং ফেরত দেওয়া হচ্ছে। এটা 'তাসলিম' নয়—অর্থাৎ এর মানে এটা নয় যে, রাসুল সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাফিরেদের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং এর মানে এই নয় যে, উইঘুর মুসলিমরা উমরাহ করতে গেলে তাদের গ্রেফতার করে চীন সরকারের কাছে উপহার দেওয়া হবে। যেমন, মরোক্কোর তাগুত—সে নিজেকে আমিরুল মুমিনিন ঘোষণা দিয়েছে। সেও একই কাজ করেছে। তার মতো মর্যাদাহীন ও নীচকে কিছু মূর্খরা নাম দিয়েছে মুজতাহিদ ও খলিফা। এরা চীন সরকারের কাছে মুসলিমদের

---

৭৮. শাফিয়ী ফিকহের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন ও গুরুত্বপুর্ণ কিতাব। —সম্পাদক

সমর্পণ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'আহমাদ উমার আবু আলি'র কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি এমনই একজন বিস্মৃত ও উপেক্ষিত মুসলিম, যিনি আমেরিকায় বন্দি অবস্থায় আছেন। আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি যেসময় সেখানে পড়তে গিয়েছিলেন, তখন রাজনৈতিক কারণে সৌদি সরকার ও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় কুফফারদের নজরদারি ও চাপের মধ্যে ছিল। তারা নিজেদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুগত প্রমাণ করতে কুরবানির জন্য বাছাই করে উমার আবু আলির মতো কিছু যুবকদের। তারা বোঝাতে চাইল, 'আমরা আপনাদের সাথে আছি—যে বা যারা আপনাদের বিরুদ্ধে, আমরাও তাদের বিরুদ্ধে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আর কখনো কোনো চরমপন্থী বা মৌলবাদী তৈরি করবে না।'

তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে। এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ভয়ানক কারাগারে বন্দিজীবন পার করছেন। তারা বিলাদুল হারামাইনে থাকাকালে তাঁকে নির্যাতন করে, তাঁর এক স্বীকারোক্তিও রেকর্ড করে। এই স্বীকারোক্তিসহ তাঁকে উপহার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করে দেওয়া হয়। এ কারণে তিনি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দি রয়েছেন। অনেক বছর আগে তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য আমকে বলেছিল, সে কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। একজন দায়ি হবার জন্য কেবল তাওহিদ ও দ্বীনই শিখতে চেয়েছিল।

কোনো মুসলিমকে নিতে অস্বীকৃতি জানানো আর প্রত্যক্ষভাবে তাকে খুঁজে বন্দি করে কাফিরদের কাছে সমর্পণ করার মাঝে পার্থক্য নিয়ে উলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন। আরও যখন ফাঁদে ফেলে কোনো মুসলিমকে ধরা হয়, নির্যাতন করা হয় এরপর কাফিরদের কাছে অর্পন করা হয়—তখন সেটা কেমন হয়, সে বিষয়টা একটু কল্পনা করুন। 'রদ' হলো কেউ একজন দারুল কুফর বা কাফিরদের বলয় থেকে খলিফা বা

মুসলিম নেতার শাসিত এলাকায় আসলো, আর তিনি তার বসবাস বা প্রবেশের ব্যাপারটা নাকচ করলেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অন্যদিকে 'তাসলিম' হলো তাকে ধরে, বন্দি করে, কাফিরদের কাছে পেশ করা। অতঃপর কাফিরদেরকে এটা জানানো যে, 'এই যে আপনাদের বন্দিকে পেয়েছি।' অথবা কারাকক্ষে বন্দি করে কাফিরদেরকে বলা, 'এসে তাকে নিয়ে যান।'

ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ আরেকটি শর্ত যোগ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতেও মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করা যাবে না। অর্থাৎ যদি তাকে মুসলিম অঞ্চলের সীমানায় ঢুকতে দেওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে এমনভাবে তাকে সীমানায় ঢুকতে অস্বীকার করা হবে, যেন কাফিররা তাকে ধরতে না পারে।' মূল কথা হলো, কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে কোনোভাবেই কাফিরদের কাছে তুলে দিতে পারে না।

ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো মুসলিম নেতা কাফিরদের সহায়তা করতে কোনো মুসলিমকে গ্রেফতার করতে পারেন না। শাইখ যাকারিয়া আনসারী রহিমাহুল্লাহ আরেকটি শর্ত যোগ করেছেন। তিনি বলেন, যে আসতে চাচ্ছে তাকে না আসার পরামর্শ দিতে হবে, আর যদি পালাতে পারে সে পালিয়ে যাবে। *'কিতাবুল উম্ম'*-এ ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন—আল্লাহর সুবিশাল দুনিয়ায় (অন্য কোথাও) তাকে পালানোর পরামর্শ দিতে হবে। *'আল-মুগনি'*-তে[৭৯] ইমাম ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন—কোনো মুসলিম নেতা তাকে কাফিরদের সাথে যেতে বাধ্য করতে পারবে না; বরং গোপনে আদেশ করতে পারে সে যেন পালিয়ে যায়, এমনকি প্রয়োজনে যারা তাকে ধরতে আসবে, তাদের সাথে যুদ্ধও করবে। *'হাশিয়াতুল কালিউন'*-গ্রন্থের লেখক বলেন, 'ফিতনার আশঙ্কা করলে এবং তারা ধরতে আসলে অবশ্যই পালিয়ে যেতে হবে।'

---

৭৯. হানবালী ফিকহের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন ও গুরুত্বপুর্ণ কিতাব। —সম্পাদক

কিছু উলামা আরেকটি শর্ত যোগ করেছেন। যেমন, *'আল-মুহাল্লা'*, *'ফাতহুল কাদির'*, *'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'* ও *'আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ'* গ্রন্থগুলোতে রয়েছে—'কোনো কাফির বিচারক মুসলিমের ওপর বিচার-ফয়সালা করবে, এটা বৈধ নয়।'

অতএব, কাফির বিচারক কর্তৃক বা কাফির আইনে তাদের বিচার করা হবে—এটা জেনেও মুসলিমদের সমর্পণ করা, ফিরিয়ে দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

কিছু আলিম আরও একটি শর্ত উল্লেখ করেছেন যে—সেই পুরুষ বা মহিলার পরিবার বা গোত্র তাকে প্রতিরক্ষা করবে, এ নিশ্চয়তা ছাড়া তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।' কেননা, আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুর কোনো ক্ষতি করা হবে না—এ নিশ্চয়তা পাওয়ার আগপর্যন্ত তাঁকে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

সাধারণ হিসেব অনুযায়ী, ছেলে ভুল করলে বাবা শাস্তি দেন। শাস্তি যত কঠিনই দেন না কেন সেটা বিষয় নয়, তিনি তো ছেলেকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি শাস্তির সীমা জানেন। তিনি হয়তো তাকে গুরুতর শাস্তি দেন, কিন্তু সেই সাথে আবার নিজ জীবন দিয়ে হলেও সন্তানকে রক্ষা করেন। এ কারণেই ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ নও-মুসলিমদের ব্যাপারে বলেছেন, তাদের বাবা ও পরিবার তাদের জন্য সুরক্ষা হতো। তারা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকত, জীবন দিয়ে হলেও তাদের রক্ষা করত। সহ্য করতে পারবে না এমন কোনো শাস্তি তারা দিত না। তাদের সমস্যা ছিল বাপ-দাদেরর ধর্ম ত্যাগ করা নিয়ে। এ জন্যই তাদের ওপর এত কঠোর হয়েছিল, যেন তারা ইসলাম ত্যাগ করে বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসে। (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সাধারণত) তাদের দ্বারা সন্তানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও স্থায়ী কোনো ক্ষতির ভয় ছিল না।

ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন—যার কোনো পরিবার বা গোত্র ছিল না, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো,

ক্ষুধায় রাখা হতো; এমনকি তাকে হত্যাও করে ফেলা হতো। আর যাদের পরিবার বা গোত্র ছিল, যদি তাদেরকে নিজ গোত্র ও পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হতো এবং তারা ইসলাম লুকিয়ে রাখত, তবে সেক্ষেত্রে তাদের আর কোনো কষ্ট থাকত না।' কারণ, বাধ্য করা হলে তো ইসলাম লুকিয়ে রাখা বৈধতা রয়েছে।

'ফাতহুল কাদির'-[৮০] গ্রন্থে এসেছে, ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন—'তাদের শেকলবদ্ধ করা, অভিশাপ দেওয়া, অপমান করা—নিজের পরিবার ও গোত্রের লোকেরাই নির্দিষ্ট মাত্রায় করত। বাইরের কেউ নয়, নিজ গোত্রই করত। ইসলাম ত্যাগ করানোর জন্যই এমনটা করা হতো। কিন্তু সেই সাথে তারা তার আত্মীয় হিসেবে এগুলোর সীমা কতটুক তাও জানত। অতএব, তাদের পরিবার বা গোত্র না থাকলে তাদের ফেরত পাঠানো যাবে না। তারা তো তাকে রক্ষা করবে।'

এই একই কাহিনিতে এক উপেক্ষিত বিষয় রয়েছে, যা এ বিষয়টাকে সমর্থন করে।

আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহু যখন শেকলপরা অবস্থায় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ধীরপায়ে এগিয়ে আসেন, তখন নবীজি তাঁর বাবাকে বলেন,

فَأَجِزْهُ لِي

'কেবল একে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও।'[৮১]

সুহাইল ইবনু আমর বলল,

مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ

---

৮০. হানাফী ফিকহের আলোকে রচিত ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'র সর্বাধিক বিস্তারিত, সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো 'ফাতহুল কাদির'। শাব্দিক ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ, পরিভাষা, উসূলে ফিকহ-সহ সার্বিকভাবেই সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। —সম্পাদক

৮১. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

'না, এ অনুমতি আমি আপনাকে দেবো না।'

তখন মিকরায বলে ওঠে, 'بَلْ قَدْ أَجَرْنَاهُ لَكَ'। এর অনুবাদ করা হয়—আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। এর দ্বারা যদি আবু জান্দালকে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই বোঝাত, তবে তো কাহিনি এখানেই শেষ। কিন্তু এ অনুবাদ সঠিক নয়। আসলে মিকরায বলেছিলেন যে—আমি কথা দিচ্ছি, তার বাবার কাছে ফেরত দিলে তাকে কোনো ধরনের নির্যাতন বা ক্ষতি করা হবে না।

যে দুর্বল মতানুযায়ী ফেরত দেওয়ার স্বপক্ষে দলিল পাওয়া যায়, সে মতের উলামায়ে কেরাম শর্ত দিয়েছেন যে, সেই মুসলিমের পরিবার বা গোত্র থাকতে হবে, যারা তার প্রতিরক্ষা দেবে। তাঁরা বলেছেন, 'আবু জান্দালের কোনো ক্ষতি করা হবে না'—এ মর্মে মিকরায কর্তৃক নিশ্চয়তা না দেওয়া পর্যন্ত রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দালকে ফেরত দিতে রাজি হননি।

আমি কেবল কিছু শর্তের নমুনা দেখাতে চেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি এ মত দুর্বল ও ভুল। তবুও আমি দেখাতে চেয়েছি, এটা তেমন হালকা নয় যেমনটা অপব্যাখ্যাকারীরা চিত্রিত করে। তারা একে এতই উন্মুক্ত ও ব্যাপক করে ফেলেছে যে—অস্বীকৃতি, অর্পণ, ফাঁদ পাতা, নির্যাতন করা এবং এসব শর্তে সম্মত হয়ে মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা সহজ একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিধান রহিত হয়েছে—এ মতটাই আসলে শক্তিশালী। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা একটা খাস পরিস্থিতি ছিল—এ মতটাই তুলনামূলক শক্তিশালী। কারণ, হাদিসের শর্তাবলি এ মতকেই সমর্থন করে। এগুলো আমরা বিস্তর আলোচনা করেছি।

অনেক মানুষের প্রশ্ন, 'হুদাইবিয়ার সন্ধির পেছনে হিকমাহ কী?'—তারা এ নিয়েই পড়ে থাকে। মাগরিবের ফরজ সলাত তিন রাকাত এবং ফজরের

ফরজ সলাত দুই রাকাত হবার পেছনে হিকমাহ বের করতে পারলে, তারা এই প্রশ্ন করতে পারত।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

فَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

'সুতরাং আল্লাহ যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে।'[৮২]

মাঝে মাঝে হিকমাহ স্পষ্ট ও দৃশ্যমান থাকে। আবার কিছু সময় থাকে না। আমি আপনাদেরকে একটি জরুরি বিষয় শেখাব। এটি হয়তো অনেক মাসআলা ব্যাখ্যা করে দেবে। আমরা জানি এ জীবনটা পরীক্ষা। আমরা আল্লাহ তাআলার বাধ্য নাকি অবাধ্য, এর পরীক্ষা। সাহাবায়ে কেরামও এর ব্যতিক্রম নন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে আত্মমর্যাদাবোধের ওপর গড়ে তুলেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর জন্য নিজেদের জান দিয়ে দিতে সবসময় ব্যাকুল ও উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁদের সাথে তেমন কোনো অস্ত্র ছিল না। তার ওপর আবার এটা কুরাইশদের জায়গা আর তারা সংখ্যায়ও বেশি। এসব সত্ত্বেও উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করে চুক্তিকে অস্বীকৃতি জানাতেও উদ্যত হয়েছিলেন। এর কারণ হলো—তারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাওহিদের সম্মানের জন্য যেকোনো অবস্থায় জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁদের গড়ে তুলেছিলেন। এজন্যই তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে এতটাই আপসহীন ছিলেন যে, আল্লাহ ও রাসুলের মর্যাদার ব্যাপারে কেউ একটি শব্দও যদি উচ্চারণ করত, তাহলে সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী ও নম্রভাষী হিসেবে প্রসিদ্ধ আবু বাকর রদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত রেগে যেতেন। এ কারণেই যখন উরওয়াহ ইবনু মাসউদ রাসুল সল্লাল্লাহু

৮২. সহিহ মুসলিম : ৬৬৩২

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছে—

فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ

'আল্লাহর কসম, আমি এমন কিছু মুখ দেখছি, যারা পালিয়ে যাবে এবং এমন বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি, যারা আপনাকে পরিত্যাগ করবে।'[৮৩]

আবু বাকর রদিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে বললেন,

امْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ

'তুমি তোমাদের লাত দেবীর লজ্জাস্থান লেহন করো! আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব?'

সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় সর্বদাই ব্যাকুল থাকতেন। এখানে যদিও আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ সাহাবিদের চিন্তার বিপরীত ছিল—কিন্তু এই আদেশই মাসলাহা (কল্যাণ)। প্রকৃতপক্ষে এটাই পরীক্ষা ছিল। তাঁদের পরীক্ষা ছিল যে, তাঁরা কি 'শোনা ও আনুগত্য' করার পর অটল কি না। তাঁরা যুদ্ধ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কতটা মহান তাঁরা—জান কুরবান করতে চাচ্ছিলেন! আর সেখানে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, আবু জান্দালকে ফিরিয়ে দেওয়া, 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখা—এগুলো ছিল তাঁদের জন্য পরীক্ষা। এগুলো তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন এগুলো আল্লাহ ও রাসুলের সুস্পষ্ট আদেশ, তখন তাঁরা পুরোপুরিই মেনে নেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজেদের সঁপে দেন।

---

৮৩. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

সেখানে আজকের দিনের উম্মাহ হলে, তারা কিন্তু যুদ্ধ করতে আনন্দিত হতো না। তারা বেড়ে উঠছে এমন কিছু লোক দ্বারা পরিচালিত সমাজে, যারা মুসলিমের অসম্মান-অবমাননাকে স্বাভাবিকীকরণ করছে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তো রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষাই ছিল নিজেদের কুরবানির মানসিকতা প্রমাণ করা, যুদ্ধ করা এবং শাহাদাত-বরণ করা। আর পরীক্ষাটা এলো ঠিক এর বিপরীতে। এটাই এ কাহিনির বিশাল বড়ো এক শিক্ষা।

হুদাইবিয়ার সন্ধির উদ্দেশ্যই যেখানে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী ও দ্বীনের মূলনীতিতে আপসকামী মাসলাহানীতির মূলোৎপাটন করা, সেখানে এর বিপরীত চিত্র কীভাবে চিত্রায়ণ করা হয়! সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধ করতেই আগ্রহী ছিলেন। আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুকে ফেরত দেওয়া যাবে না, বিসমিকাল্লাহুম্মা লেখা যাবে না, রাসুলুল্লাহ লিখতে হবে, জোর করে হলেও উমরাহ করতে হবে—এই ছিল তাঁদের মাসলাহা, ইজতিহাদ ও আকল। তারা যেটা মাসলাহা ভেবেছিলেন, যা তাদের ইজতিহাদ ছিল—আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ তার বিরুদ্ধেই গেল।

নিজের আকল বা ইজতিহাদ অনুযায়ী নিজের কাছে যেটা মাসলাহা (কল্যাণ) মনে হবে, সেটা বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ বা আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশনা মেনে নেওয়াটাই এর শিক্ষা। মাসলাহা (কল্যাণ) সেটাই, যা কুরআন-সুন্নাহয় রয়েছে। প্রবৃত্তি ও ঝোঁকের বিরুদ্ধে গেলেও নুসুসের[৮৪] অনুসরণ করতে হবে। এর পরিণতি কী, সেটা দেখার বিষয় নয়। সাহাবায়ে কেরামের জন্য এটা পরীক্ষা ছিল। তাঁরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। তাঁরা যা চাচ্ছিলেন এবং যেটাকে মাসলাহা মনে করেছিলেন—আল্লাহর নির্দেশনা সেটার বিরুদ্ধে যাওয়ার পর তাঁদের অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য, তাঁদেরকে আশ্বস্ত করে, রাসুল সল্লাল্লাহু

৮৪. নস (نص) শব্দের অর্থ মূল পাঠ, মূল সূত্র, Text। বহুবচনে নুসুস (نصوص)। পরিভাষায়, কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যকে নুসুস বলা হয়। –অনুবাদক

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলা ওহী নাজিল করেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

'আমি তোমাকে দিয়েছি এক সুস্পষ্ট বিজয়।'[৮৫]

তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এই আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াতের পর আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي
أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ
جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

'যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ত্রুটি মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামাত পূর্ণ করেন, আপনাকে সরলপথে পরিচালিত করেন। আর আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। আসমান-জমিনের বাহিনী আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৮৬]

তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, যাকে মাসলাহা (কল্যাণ) মনে করেছিল তার বিরুদ্ধে যাবার পর, আল্লাহর নির্দেশনার সামনে আত্মসমর্পণ করার পর—আল্লাহ আশ্বস্ত করেছেন, তাদের রুহ শক্তিশালী করেছেন। অতএব, কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে মাসলাহা আছে মনে করলে জেনে রাখতে হবে, এটা ভুল। মাসলাহা সেটাই, যা কুরআন-সুন্নাহয় রয়েছে।

---

৮৫. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ০১
৮৬. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২-৪

হুদাইবিয়া সন্ধির আরেকটি শিক্ষা ও বার্তা হচ্ছে *'ফাতহুল বারী'*তে আসা ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহর বর্ণনাটি। তিনি বলেছেন—'যাঁরা পরামর্শ দিয়েছিলেন আবু জান্দালকে তাঁর বাবার কাছে ফেরত পাঠানো উচিত হবে না, তাঁরা পরবর্তীকালে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁরা যা অপছন্দ করেছিলেন, তারচেয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই উত্তম ছিল।'

হুদাইবিয়ার শিক্ষায় আল্লাহ ও রাসুলের অন্ধ আনুগত্য ছাড়া আর কোনো ধরনের আপস নেই। নিজের কাছে যেটা মাসলাহা মনে হবে তা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলাই এর শিক্ষা। আল্লাহর হুকুমের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা আর প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও আকল-সহ যা কিছু আছে, সবকিছুকে একপাশে ছুড়ে ফেলা। হুদাইবিয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, যদিও মনে হয় যে এটা বিপর্যয়। ইয়াকিনের সাথে জানতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যই একমাত্র পথ। কারণ, উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই। আর কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীরাই প্রকৃত মুত্তাকি।

*'সহিহ বুখারী'*র বর্ণনায় সাহল ইবনু হুনাইসের একটি কথা পাওয়া যায়। তিনি মক্কা থেকে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমদিকে যারা এই সন্ধি মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, তিনিও ছিলেন তাদের একজন। এরপর এটা যে আল্লাহর হুকুম, তা জানার পর সবার মতো তারও দ্বিধা কেটে যায়। হুদাইবিয়া সন্ধির সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তিনি বলেন—

اتَّهِمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ

'নিজেদের মতামতকে চূড়ান্ত ভেবো না। আবু জান্দালের ঘটনার দিন আমি নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন কোনটা উত্তম।'[৮৭]

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও একই ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً

'আমি এর জন্য (অর্থাৎ, হুদাইবিয়া সন্ধির দিন ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসেবে) অনেক নেক আমল করেছি।'[৮৮]

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মেনে নিতে দেরি করা ও দ্বিধার জন্য কাফফারা হিসেবে তিনি বিভিন্ন আমল, যেমন—সদাকাহ, সিয়াম, দাসমুক্তির মতো নেক আমল করেছেন। তিনি এর কাফফারা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতএব, বোঝা গেল তিনি শুনেছিলেন এবং মেনেছিলেন।[৮৯]

হুদাইবিয়া ও উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর এ উপলব্ধি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, মন যেটা মাসলাহা মনে করে, সে অনুযায়ী চলা যাবে না। সবকিছুকে

---

৮৭. সহিহ বুখারী : ৪১৮৯

৮৮. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

৮৯. উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আমার কাজের কারণে অনুতপ্ত হয়ে দুহাতে সদাকাহ ও গোলাম আযাদ করেছি। আমি সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলাম, সে জন্য খুব ভয়ে ছিলাম। আমি আশা করছিলাম যেন কল্যাণকর কিছু হয়।' (সীরাতু ইবনি হিশাম : ৩/৩৩১)। তিনি আরও বলেন, 'ভাইয়েরা, দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মতকে পূর্ণাঙ্গ ভেবো না। আমার মনে আছে, আবু জান্দাল যেদিন এসেছিল, সেদিন আমি নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর রাসুলের সিদ্ধান্তকে প্রায় প্রত্যাখ্যানই করছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, পরবর্তীকালে সত্যগ্রহণে আমি কখনো অনীহা দেখাইনি।'(মুসনাদু বাযযার : ১৮১৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৬/১৪৫-১৪৬)। (দেখুন : রউফুর রহিম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮২-১৮৫, সিয়ান পাবলিকেশন প্রকাশিত)। –অনুবাদক

বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ কী বলে সে অনুযায়ী চলতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর হুকুমেই সকল মাসলাহা ও বিজয় নিহিত, যদিও সে সময় সেটা বোধগম্য না হয়। সাহাবায়ে কেরামই আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরাই কুরআন-সুন্নাহর সবচেয়ে ভালো বুঝ রাখতেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁরাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী। কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো মাসলাহার পথ গ্রহণ করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন আল্লাহ ও রাসুলের সবচেয়ে বেশি অনুগত। কোনো বিষয়ে তাঁদের চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ করবে এমন আকলধারী কেউ নেই। অথচ তাঁরা বলতেন—কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে নিজ মতামত, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, আকল প্রত্যাখ্যান করো।

তাঁরা কেবল কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই এ কথা বলেননি, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে হাতেকলমে অর্জিত অভিজ্ঞতাও ছিল এ কথার ভিত্তি।

কুরআন-সুন্নাহ বোঝা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের আকল সীমাবদ্ধ। তাই আকল দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর অর্থকে বিকৃত ও অচল করা যাবে না। কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে নিজ আকল ও মনকে অসংযত কল্পনায় নিমজ্জিত করা—অর্থাৎ, এমন দাবি করা যে, নিজে যা চিন্তা করেন বা বলেন সেটাই মাসলাহা—তাহলে এ ধরনের চিন্তাধারার মানে হচ্ছে আপনি আল্লাহর চেয়েও বেশি জ্ঞান রাখেন।

বিশুদ্ধ মন কখনো ওহীর সাথে সংঘর্ষ তৈরি করবে না। দূষিত আত্মাই এটা করে থাকে। আসরের রাকাত-সংখ্যা কেন চার, মাগরিবের কেন তিন, আমরা কেন ফজর থেকে যুহর পর্যন্ত না করে মাগরিব পর্যন্ত সিয়াম-পালন করি—আকল কখনোই এসবের মাসলাহা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। বায়ুত্যাগে ওজু ভেঙে যাওয়ায় আবার কেন তাকে ওজু করতে হবে, যে এই মাত্র ওজু করে বের হয়েছে—এর পেছনের মাসলাহা বা হিকমাহ কী—আমাদের সীমাবদ্ধ আকল তা বলতে পারবে না। সুতরাং

দ্বীনের মূলনীতির বিরুদ্ধে মাসলাহা-নীতি ব্যবহারের কোনো যোগ্যতাই তো এ আকলের নেই।

এরপর আবু বাসির ও আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে কী ঘটেছিল? যারা মুসলিমদের অর্পণের জন্য এই কাহিনিকে দ্বীনের মূলনীতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তাদের তো উচিত পুরো কাহিনিকেই ব্যবহার করা।

চলুন আমরা জেনে নিই, কী হয়েছিল এরপর।

এরপর আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসার পর নও-মুসলিম আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে পালিয়ে তাঁর কাছে চলে যান। কুরাইশরা তাকে খুঁজে আনতে দুজন লোক পাঠায়। তারা গিয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চুক্তিপূরণের কথা বলে। তিনিও চুক্তি মোতাবেক আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দেন। তবে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আল্লাহ তাঁকে মুক্তির পথ করে দেবেন। তারপর এ দুজন আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পথে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য থামে। তারা সেখানে বসে খেজুর খেতে আরম্ভ করে। সুযোগ বুঝে আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহু কৌশলে তাদের একজনের থেকে তরবারি নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। অপর ব্যক্তি ভয়ে পালিয়ে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসে। তাকে দেখে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا

'এই ব্যক্তিটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে।'[৯০]

---

৯০. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

সেই লোক রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল,

قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ

'আল্লাহর কসম, আমার সাথিকে হত্যা করা হয়েছে, আমাকেও হত্যা করা হতো!'

এমন সময় আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন,

يا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ -واللَّهِ- أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ؛ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيهِم، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ منهمْ

'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে (চুক্তি মেনে) তাদের কাছে ফেরত দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।'[৯১]

আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

'সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী। কেউ যদি তাকে বিরত রাখত।'[৯২]

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন, তবে এ ঘটনার পর তিনি তাঁকে চপেটাঘাতও করেননি কিংবা পুনরায় কুরাইশদের হাতেও তুলে দেননি। তিনি কুরাইশদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তাঁকে বেঁধেও রাখেননি। এ ধরনের দণ্ড প্রদান করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও করেননি।

---

৯১. প্রাগুক্ত

৯২. সহিহ বুখারী : ২৭৩১, ২৭৩২

কিন্তু আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহু মনে করলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি তাঁকে আবারও ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি পালিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় চলে যান। তবে তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে—তিনি যা করেছেন, তাতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মৌনসম্মতি ছিল। কারণ, কোনো ভুল দেখলে তিনি সমালোচনা করতে দেরি করতেন না। যদি তিনি আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহুর কৃতকর্মের বিরোধীই হতেন, তবে প্রকাশ্যেই বলতেন। নিজ ক্ষমতাবলে তাকে বাধা দিতেন কিংবা থামানোর ব্যবস্থা করতেন।

ইমাম ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন—আবু বাসির বুঝেছিলেন, এটা তাঁর জন্য এবং যারা মক্কা থেকে পালিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিতে চায়, তাদের জন্য একটি সুযোগের ইঙ্গিত। আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুও এসে তাঁর সাথে সাগরতীরে যোগ দেন। কুরাইশদের সিরিয়াগামী কাফেলাগুলো যেই পথ দিয়ে যাত্রা করে, সমুদ্রতীরবর্তী এমন একটি এলাকা তাঁরা বেছে নেন। সেখানে একটি ক্ষুদ্র ঘাঁটি তৈরি করে ফেলেন তাঁরা। চুক্তির ধারার কারণে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে পারছিলেন না, এমন সকল নও-মুসলিম এসে তাঁদের যোগ দিতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত এটি ছোটো কিন্তু শক্তিশালী একটি দলে পরিণত হয়ে যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তাঁদের সদস্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ। আবার কিছু বর্ণনামতে সত্তর। সুহাইল ইবনু আমরের ভাষ্যমতে তিনশত বা আরও বেশি সদস্য ছিল সেই বাহিনীতে। সদস্যসংখ্যা যতই থাকুক, গুরুত্বপূর্ণ এটাই ছিল যে, তাঁরা এমন এক গেরিলা-বাহিনী গঠন করেছিলেন যা সিরিয়াগামী কুরাইশদের প্রত্যেক কাফেলায় হামলা চালাত। মক্কায় থাকাকালীন তাদের ওপর কুরাইশ কাফিরদের করা অত্যাচারের প্রতিশোধস্বরূপ তাঁরা কুরাইশদের ওপর হামলা, হত্যাসহ তাদের সম্পদ জব্দ করতেন।

যারা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করতে হুদাইবিয়ার কাহিনি ব্যবহার করে,

তাদের তো উচিত পুরো কাহিনিকেই ব্যবহার করা। আসলে তারা হক বলবে তো দূরের কথা, হক নিয়ে চিন্তা করতেও ভয় পায়। আজকের যুগে যারা আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহুর মতো, তাদেরকে কি তারা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এতটুকুই বলে?

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

'সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী। কেউ যদি তাকে বিরত রাখত।'

নাকি তারা আবু বাসিরের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের ব্যাপারে খুব মর্যাদাহানিকর শব্দ ব্যবহার করে? কাফির ও তাগুতদের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁদের বিভিন্ন ট্যাগ দেয়?

মূলত আজকের অপব্যাখ্যাকারীরা যদি তখন থাকত, তবে কুরাইশদের সাথে করে আবু বাসির ও তাঁর সাথিদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। তাঁদের ধ্বংস করার জন্য কামানের গোলা নিক্ষেপ করত, তাঁদের গ্রেফতার করত, নানা অপবাদ দিতো।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও, মূলত এতেই রয়েছে মাসলাহা। এতেই রয়েছে বিজয়। নিজের মন যাকে মাসলাহা বলে সেটা মাসলাহা নয়।

অবশেষে কুরাইশরা আবেদন করল আবু বাসির ও তাঁর সাথিদের যেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ডেকে পাঠান এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিলো যে, যে-ই রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে, সে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁদের ডেকে পাঠান।

আপাতদৃষ্টিতে যা পরাজয় মনে হয়েছিল তা-ই বিজয়ে রূপ নিল। কুরাইশরা ভেবেছিল চুক্তির এই ধারাগুলোর মাধ্যমে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে নমনীয় করে ফেলবে। অবশেষে তারাই নমনীয় হয়ে আবু বাসির রদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথিদের ফিরিয়ে নিতে আবেদন জানায়। আর এভাবেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর এরপর থেকে মুসলিম হিসেবে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসা প্রত্যেক ব্যক্তি কুরাইশদের কাছ থেকে নিরাপদ ছিল। কারণ, এটি ছিল আল্লাহর ওয়াদা। যেকোনো ধরনের ক্ষতি থেকে তাঁরা নিরাপদ ছিলেন, মুক্তি পেয়েছিলেন কিংবা কোনো-না-কোনো উপায়ে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন।

সুতরাং, এটা ছিল সুস্পষ্ট বিজয়। নিজেরা যেটাতে মাসলাহা চিন্তা করছিলেন, তার অনুসরণ না করে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের জন্যই এ বিজয়। ওই চুক্তি বিজয়ে পরিণত হয় এবং ওটাই ছিল মাসলাহা। যদিও তাঁরা ভেবেছিলেন ওটা পরাজয়। কিন্তু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী চলে সবশেষে বুঝতে পারেন ওই চুক্তিই ছিল বড়ো বিজয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলিমদের জন্য সম্মান ও মর্যাদার সন্ধি, বিজয়ের সন্ধি। এই চুক্তি ইসলাম ও মুসলিমের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একহাজার চারশো লোক নিয়ে হুদাইবিয়াতে গিয়েছিলেন। তখন সন্ধি-চুক্তি করে ফিরে আসেন। আর এর মাত্র দুবছর পর দশহাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মক্কায় যান বিজয়ের অভিযানে। আর আল্লাহ তাঁকে কোনো বড়ো রকমের যুদ্ধ ছাড়াই প্রতিশ্রুত বিজয় দান করেন এ অভিযানে।

এরপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশ ও সাম্রাজ্যের শাসকদের কাছে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত-সংবলিত রাষ্ট্রীয় ফরমান পাঠান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় বিশটি বাহিনীকে সারিয়া[৯৩]

৯৩. যেসব যুদ্ধ-অভিযানে স্বয়ং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করতেন না, সেগুলোকে 'সারিয়া' বলা হয়। আর যেগুলোতে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ থাকতেন, সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া। –অনুবাদক

অভিযানে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি খাইবারও বিজয় করেন। মুসলিমরা হাবাশাহ থেকে ফেরা শুরু করে। ইয়ামানবাসীও ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। পরের পছর সম্মানের সহিত রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজও সম্পন্ন করেন।

যদিও সাহাবায়ে কেরাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এতে বিজয় দেখতে পাননি, কিন্তু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চুক্তিকেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় হিসেবে প্রমাণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি কুরাইশদের আত্মাগুলোকে বের করে আনে। ইসলাম ও মুসলিমের শক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষের অন্তরসহ জমিনের বুকেও ইসলামকে বিস্তৃত করে। অন্যদিকে আজকের যুগের আপসকামী নেতাদের করা চুক্তি ইসলামকে মানুষের অন্তর থেকে মুছে দেয়। জমিনে মুসলিমদের অবস্থান দুর্বল করে তোলে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হুদাইবিয়ার সন্ধি কোনো আবরণ নয় যে, যারা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করে, তাদের অসম্মান ও লজ্জা ঢেকে রাখবে। বরং, হুদাইবিয়ার সন্ধি এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমাদের রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদাবোধ-সম্পন্ন নেতা ছিলেন। যে দ্বীনের প্রচারের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, সেই দ্বীনের ব্যাপারে আপসকামী হিসেবে তাঁকে চিত্রিত করবেন না। আমাদের রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আমাদের জন্য সাহস ও সম্মানের নিদর্শন। হুদাইবিয়ার সন্ধির হাকিকত হলো সেটা, যা আপসকামীরা চিন্তা করতেও ভয় পায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধির হাকিকত হলো এ কথার মর্মার্থ—

أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيْلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ

'হে লোক-সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যারা আমাদের

বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?'[৯৪]

হুদাইবিয়ার সন্ধির হাকিকত হলো এ কথার মর্মার্থ—

وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي.

'কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—আমার গর্দান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'[৯৫]

হুদাইবিয়ার সন্ধির হাকিকত হলো এ কথার মর্মার্থ —

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

'সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলনকারী। কেউ যদি তাকে বিরত রাখত।'

মুরজিয়া, মডার্নিস্ট ও যিনদিকসহ যারা দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করে, তাদের কাউকে কি কখনো এভাবে কথা বলতে শোনা যায়?

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সমালোচনা করেননি। তিনি কুরাইশদের সাথে তাল মিলে তাঁদের বাজে নামেও ট্যাগ দেননি। অথচ, তাঁর একটি শব্দ, মাত্র একটি ইঙ্গিত আবু বাসির ও আবু জান্দাল রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে থামিয়ে দিতে পারত—কিন্তু তিনি তাঁদের নিবৃত্ত হতে বলেননি।

---

৯৪. প্রাগুক্ত

৯৫. প্রাগুক্ত

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করেছেন। পুরো ইসলামজুড়েই আত্মমর্যাদাবোধ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'মর্যাদা তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'[৯৬]

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তাঁকে ভালোবাসি—কারণ, তাওহিদ মানে এক আল্লাহর দাস হওয়া। এক আল্লাহর দাস হওয়ার অর্থ, আপনি অন্য কারও বা কোনোকিছুর দাস নন। এটাই আত্মমর্যাদাবোধের সংজ্ঞা। এ মর্যাদা অনুভব না করলে নিজের ঈমানকে আবার যাচাই করতে হবে। একজন তাওহিদবাদী মুসলিমকে কারাকক্ষে চাবুকের কশাঘাত করা হলেও সে মর্যাদা অনুভব করে। স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা বিপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারার কারণে সে মর্যাদা অনুভব করে। বিজয় কিংবা পরাজয় উভয় অবস্থায়ই তার জন্য রয়েছে মর্যাদা। তাওহিদবাদীদের অন্তরে দ্বীনি মর্যাদাবোধ সবসময় স্পন্দন তোলে। এ এক অনির্বাণ উজ্জ্বলতা, যা তাওহিদের প্রকৃত অনুসারীদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

সব ব্যাপারে আপস করা গেলেও, পূর্ব-পশ্চিমের তাগুতদের সমালোচনায় আপস চলে না। তাগুতরা যা চায়, তাতে আপস চলে না। আপসকামীরা নিজেদের স্বপক্ষে তাগুত ও তাদের সমর্থনকারী আলিমদের বয়ানে যা আছে, তা থেকেই প্রমাণ আনতে পারে, কিন্তু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত থেকে আনতে পারবে না। তারা আমাদেরকে দুর্বল ও নির্যাতিত উম্মাহ করে রাখার বিষয়টাকে স্বাভাবিকীকরণ করতে চায়।

---

৯৬. সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮

অথচ, আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ এবং সকল উম্মাহর নেতৃত্বের দায়িত্ব আমাদেরই কাঁধে।

এ দ্বীন মহিমান্বিত। এ দ্বীন গৌরব ও সম্মানের দ্বীন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখও কোরো না। যদি তোমরা (প্রকৃত) মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[৯৭]

উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই আয়াত ঠিক এর পরপরই নাজিল হয়। এমনকি সবচেয়ে মুসিবাতের সময়েও আল্লাহ চান বান্দা সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করুক। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ

'তোমরাই বিজয়ী হবে।'

দ্বীনের সাথে আপস করে, সাহাবায়ে কেরামের রক্ত ও ঘামে আবাদ হওয়া ভূমিতে আল্লাহর শত্রুদের থাকার বিষয়টা স্বাভাবিকীকরণ করে জায়োনিস্ট ও ক্রুসেডারদের সাথে বশ্যতামূলক যে চুক্তি করা হয়, তাকে আল্লাহ যে চুক্তিকে ফাতহুম মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলেছেন, তার সাথে তুলনা করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ যে চুক্তিকে ফাতহুম মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় বলেছেন, তাকে এমন চুক্তির সাথে তুলনা দেওয়া যাবে না, যা জাতিসংঘের বশ্যতা বয়ে আনে। এ ধরনের কাজ মানেই আমাদের সম্মানিত ও মহান উম্মাহকে শত্রুদের দয়া এবং তাগুতদের আইনের অধীন করার অপচেষ্টা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখার

৯৭. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৯

জন্য এই উম্মাহকে গড়ে তোলেননি যে, 'পবিত্র জায়গার আঙিনায় এই উম্মাহর নারীদেরকে শূকরতুল্য কাফিরদের বংশধররা অত্যাচার করবে, আর এদিকে আত্মমর্যাদাহীন দুর্বলচিত্তের লোকেরা সেটা দেখে একের পর এক তাগুতের বশ্যতাস্বীকারে দৌড়াবে'। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

'দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মাঝে প্রবেশ করে তারা বলে—আমরা আশঙ্কা করি, পরে না আমরাও কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে যাই।'[৯৮]

এমন মানসিকতার সবাই আজ শত্রুদের সামনে নতজানু হয়ে আছে। অপমানিত হয়ে তাদের করুণা-প্রার্থনা করছে। দ্বীনের মূলনীতিতে আপস করে চুক্তি সাক্ষর করছে। তাদের এসব অসম্মানজনক ও অবৈধ চুক্তিকে স্বাভাবিকীকরণ করছে, সহনীয় করে তুলছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে এগুলো বৈধ হবার পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যাবে না—আমরা এ কথা প্রমাণ করেছি। সীরাতের পাতা উলটিয়ে এ ঘটনার চার বছর আগে সংঘটিত হওয়া গাযওয়াতু বানু কাইনুকা দেখুন, অথবা দুবছর পর মুতার যুদ্ধ দেখুন। সীরাতের যেকোনো জায়গা থেকে দেখুন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতেন—যদি একজন নারীকে সামান্যও লাঞ্ছিত করা হতো! যে আঙিনা থেকে—অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম থেকে তিনি মিরাজের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন, সেটা তো দূরের কথা, পৃথিবীর অন্য কোনো এক প্রান্তে হলেও তিনি কী করতেন?

এ বিষয় নিয়ে কথা বললে অনেক কথা বলা যাবে। তবে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ আপনাদের সিয়াম, কিয়াম ও সকল ইবাদাত কবুল করুন। আল্লাহ সেই তাওহিদপন্থিদের কবুল করুন, যারা তাঁর নামকে সুউচ্চে তুলে ধরতে

---

৯৮. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫২

সংগ্রামরত। আল্লাহ তাঁদের প্রকাশ্য বিজয় দান করুন—যে বিজয় প্রত্যেক তাওহিদবাদীর অন্তরকে প্রশান্ত করে আর প্রত্যেক কাফির-মুনাফিককে মর্মপীড়া দেয়।

সমাপ্ত

প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

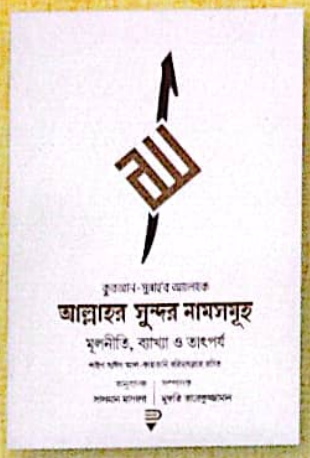

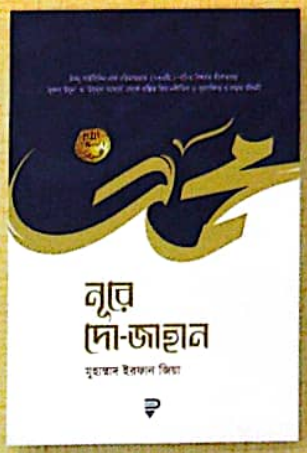

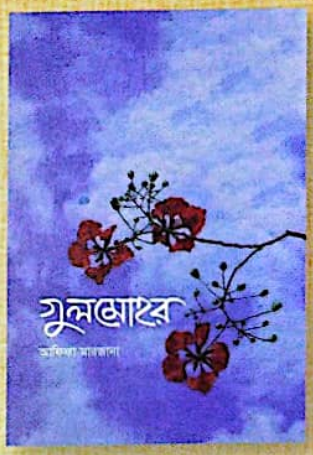

গুলমোহর	আফিফা মারজানা
ইয়াসমীন	আফিফা মারজানা
মর্ডানিস্ট ও হাদিস অস্বীকারকারী	সাজিদ আবদুল কাইয়্যুম
কুরআনিস্ট মতবাদ : সংশয় ও খন্ডন	ড. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ আল খালাফ
সর্বোত্তম জীবনবিধান	সালমান মাসরুর (অনূদিত)
খনি (মহামূল্যবান রত্নভান্ডার)	শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল
বিবাহ অভিযান	শাকির মাহমুদ সাফাত
নূরের মজলিস	শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম

CamScanner

ঐতিহাসিক 'হুদাইবিয়ার সন্ধি'—কুরআনুল কারিমে যাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সুস্পষ্ট বিজয়' নামে। একটি প্রতিষ্ঠিত জোট, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থার মোকাবিলায় সত্যের ঝান্ডা নিয়ে মদিনায় জন্ম নেওয়া ছোট্ট ও নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক দলিল। সত্যই সুস্পষ্ট বিজয়। মিথ্যার সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব। মিথ্যার সামনে সত্যানুসারীদের সিনা টান করে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা।

তবে এর সাময়িক শান্তিচুক্তির ধারা যুগ যুগ ধরে নিজেদের পরাজিত ও আপসকামী মানসিকতার দলিল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে বাতিলের সাথে আপসকামীরা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্বীনের খণ্ডিত বয়ান নিয়ে হাজির হওয়া, দ্বীনকে কাটছাঁট করে উপস্থাপন, বাতিলের পছন্দসই পন্থায় ইসলামকে চিত্রায়ণ—আজকাল এমন নানা উপায়ে পরাজিত মানসিকতা ও আপসকামিতার মানহাজকে বৈধপ্রমাণে করা হচ্ছে বিভিন্ন কসরত।

তাই এ ঐতিহাসিক সন্ধির হাকিকত নিয়ে ব্যাখ্যামূলক স্বতন্ত্র রচনার যেন একান্তই প্রয়োজন ছিল। আর এ বইটি সেই প্রয়োজন পূরণেরই একটি ছোট্ট প্রয়াস। বইটি মূলত শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের লেকচার সিরিজ 'The Treaty of Hudaybiyyah : Falsehood vs Facts'-এর গ্রন্থিত রূপ।

পেনফিল্ড
পাবলিকেশন

978-984-97180-4-8

CamScanner